শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

জাগ্রত চেতনা

তৃতীয় খন্ড



বৈদিক শাস্ত্রের শাশ্বত জ্ঞান

প্রশ্নোত্তর • মনসংযমের কৌশল • মৃত্যুর পরে জীবন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জাগ্রত চেতনা

তৃতীয় খণ্ড

বৈদিক শাস্ত্রের শাশ্বত জ্ঞান

প্রশ্নোত্তর ○ মনসংযমের কৌশল ○ মৃত্যুর পরে জীবন



আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য ঃ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ

ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

সংকলক ও প্রকাশক ঃ বিদ্যালয় প্রচার বিভাগের পক্ষে
শ্রীআনন্দবর্ধন দাস

প্রথম সংস্করণ ঃ ৩,০০০ কপি, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ছাত্র সম্মেলন, ২০০৬

এই পুস্তিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানতে
নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ
ইস্‌কন বিদ্যালয় প্রচার বিভাগ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
পিন-৭৪১৩১৩
ফোন ঃ (০৩৪৭২) ২৪৫০৬৪, ২৪৫৪৯৮

মুখবন্ধ

আজ সারা পৃথিবী কর্মমুখর কেবল দেহটির তৃপ্তির জন্য। নির্জীব দেহ আত্মাকে কিছুকাল ধারণ করে শেষ হয়ে যায়। কেন শাশ্বত আত্মা অনিত্য জড় দেহে বদ্ধ হয়? এই মৃত্যুময় ভবসাগরে, এই জগতে কেন বদ্ধ হয় চেতন আত্মা ?

আমরা আনন্দ চাই। জড় দেহের মাধ্যমে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে আনন্দ, তা আনন্দ নয়, মাংসল তৃপ্তি, কেবল নিম্নচেতনা সম্পন্ন পশুরাই তাতে তৃপ্ত থাকে। বিশুদ্ধ নিষ্কলুষ আনন্দ কোথায়? জীবন নিত্য, কিন্তু আমাদের বর্তমান অস্তিত্ব দুঃখময়। কিভাবে লাভ করা যায় আনন্দময় নিত্য জীবন ?

পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, কিন্তু এই মৌলিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সেখানে কোনো আলোচনা গবেষনা নেই। রসায়ন, পদার্থবিদ্যার মাধ্যমে জড়পদার্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের বিপুল আয়োজন কেবল জীবনের জটিলতাই বৃদ্ধি করে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা তাই কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির শিক্ষা দেয়। লোভ আর হিংসা, সম্পদ কুক্ষিগত করা আর অস্ত্রশস্ত্রের পাহাড় তৈরী-এই শিক্ষার অন্তিম ফল। সর্বত্র চূড়ান্ত অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, যে কোনো মূহূর্তে বিপদের আশঙ্কা।

এই শিক্ষাব্যবস্থা অন্ধ। জীবন কি — কোনো উত্তর নেই। জীবনের পরম উদ্দেশ্য কি — কেউ জানে না। শিক্ষার নামে মানুষকে একগাদা মিথ্যে বোঝানো হচ্ছে।

জড়পদার্থ থেকে জীবন, মহাবিস্ফোরনের ফলে জগতের সৃষ্টি, বানরের মানুষে পরিণত হবার বিবর্তন —সবই অনুমান, কল্পনা।

বৈদিক শাস্ত্র বিশেষতঃ ভগবদ্গীতা, ভাগবতরূপ সূর্যালোক রয়েছে। জীবন ও জগতের পরম বিজ্ঞান, পরম সত্য সেখানে বিধৃত রয়েছে। এখন কলিযুগ। এই যুগে নানাবিধ অধার্মিক কার্যকলাপ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। যা আমরা এখনই চারপাশের ঘটনাবলীর মধ্যে বুঝতে পারছি। ভগবান আবার ভূভার হরণের জন্য সরাসরিভাবে আসবেন এই কলিযুগের শেষে কল্কিরূপে। কিন্তু কলিযুগের মানুষদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তনি ইতিমধ্যে আজ থেকে ৫১৯ বৎসর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়ে কলিযুগের যন্ত্রনা থেকে বাঁচবার সুরক্ষা, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রদান করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মুহূর্তে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সম্মুখে অবস্থান না করলেও আমরা অনায়াসেই তাঁর সঙ্গ লাভ করতে পারি এই হরিনাম জপ ও কীর্তনের মধ্য দিয়ে। তাঁর নাম এই যুগে আমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

তাই আমাদের উচিৎ মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরন করে সংযতভাবে, জীবন মৃত্যু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা এবং জড়শিক্ষার সঙ্গে ভগবৎতত্ত্ব বিজ্ঞানের সংযোগ সাধন করে উন্নততর সভ্যতা গড়ে তোলার লক্ষে এগিয়ে যাওয়া। সেই উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থসমূহ (গীতা, ভাগবত, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ইত্যাদি) থেকে পরমার্থ শিক্ষা সমৃদ্ধ প্রশ্নোত্তর, মনসংযমের কৌশল, মৃত্যুর পর জীবন বিষয় অবলম্বনে এই পুস্তিকাটি (জাগ্রত চেতনা-৩য় খন্ড) প্রকাশ করা হল। আমাদের আশা ছাত্র-ছাত্রীরা এই পারমার্থিক শিক্ষানুযায়ী জীবনযাপন করে মনুষ্য জীবনকে সফল করে তুলতে প্রয়াসী হবেন।

ইতি
ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী
নির্দেশক, জাগ্রত ছাত্রসমাজ
ইস্কন, শ্রীমায়াপুর।



"বৈদিক-সভ্যতা এবং বেদ অধ্যয়ন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ভগবদ্ভক্তির আদর্শস্তরে উন্নীত করা। তাই বৈদিক প্রথায় জীবনের শুরু থেকেই ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে শৈশব থেকে, অর্থাৎ পাঁচবছর বয়স থেকেই মানুষ এমনভাবে আচরণ করতে শেখে, যার ফলে সে পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারে। .... কৃষ্ণভাবনাময় আন্দোলন মানব সমাজের সেবা করার জন্য আগ্রহী, মানুষকে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা প্রদান করে যা মানুষকে পুণরায় পশুজীবনে অধঃপতিত হওয়ার থেকে রক্ষা করতে পারে। .... সমস্ত স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গৃহে সমস্ত শিশু এবং যুবকদের ভগবানের কথা শ্রবণ করার শিক্ষা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ, তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত কিভাবে ভগবদ্গীতার উপদেশ শ্রবণ করতে হয়, সেই উপদেশ অনুসারে জীবন যাপন করতে হয় এবং তার ফলে পশুজীবনে অধঃপতিত হওয়ার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে সুদৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে ভগবদভক্তিপরায়ন হতে হয়।" (ভাঃ ৭/৬/১ তাৎপর্য থেকে)

— শ্রীল প্রভুপাদ



প্রশ্নোত্তরে পারমার্থিক জ্ঞান

১। বেদ কি? তার তিনটি বিভাগ কি কি?

উত্তর ঃ বেদ শব্দটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। যে জ্ঞানই আমরা গ্রহণ করি না কেন তা বেদ থেকেই এসেছে। বৈদিক জ্ঞান আসছে অপ্রাকৃত জগৎ থেকে —শ্রীকৃষ্ণ থেকে। বেদের আর একটি নাম হচ্ছে 'শ্রুতি'। বেদ হচ্ছে মাতা এবং পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পিতা। এই জ্ঞান সর্বপ্রথম লাভ করেছিলেন ব্রহ্মা, তারপর পরম্পরাক্রমে এই ত্রুটিমুক্ত জ্ঞান প্রবাহিত হয়।

বেদের তিনটি বিভাগ —কর্মকান্ড, জ্ঞানকান্ড ও উপাসনা কান্ড।

২। জড় শরীরের সাতটি স্তর কি কি ?

উত্তর ঃ চামড়া, মাংস, হাড়, পেশী, মজ্জা, চর্বি ও বীর্য

৩। দেহের ভারসাম্য রক্ষাকারী ৫টি বায়ু কি কি ?

উত্তর ঃ প্রাণ, ব্যান, উদান, অপান ও সমান।

৪। জড়জগৎরূপ কর্মক্ষেত্রের ২৩টি উপাদান কি কি ?

উত্তর ঃ পঞ্চমহাভূত — মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ
তিনটি সূক্ষ্ম উপাদান — অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় — চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক

পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় — বাক (কথা বলার ইন্দ্রিয়), হাত, পা, পায়ু ও উপস্থ (লিঙ্গ)

পঞ্চ তন্মাত্র — রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ -

৫। ছয় প্রকারের দৈহিক প্রতিক্রিয়া কি কি ?

উত্তর ঃ
- ✤ চেতনা
- ✤ ইচ্ছা
- ✤ সুখ
- ✤ বিশ্বাস
- ✤ দ্বেষ
- ✤ হতাশা

৬। জড়জাগতিক লোকের চারটি ত্রুটি কি কি ?

উত্তর ঃ
- ✤ ভ্রম — ভুল করার প্রবণতা।
- ✤ প্রমাদ — মোহ গ্রস্ত হওয়া — অবাস্তবকে বাস্তব বলে মনে করা।
- ✤ বিপ্রলিপ্সা — প্রতারণা করার প্রবৃত্তি।
- ✤ করনাপাটব — ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা।

৭। ছয় প্রকারের শত্রু (আগ্রাসনকারী) কারা- যাদের হত্যা করলেও কোনো প্রকার পাপ হয় না ?

উত্তর ঃ (১) যে বিষ প্রয়োগ করে।

(২) যে ঘরে আগুন লাগায়

(৩) যে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে।

(৪) যে ধনসম্পদ লুন্ঠন করে

(৫) যে অন্যায়ভাবে জমি দখল করে।

(৬) যে বিবাহিত স্ত্রীকে হরন করে।

—এই ধরণের শত্রুদের অবিলম্বে হত্যা করার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। এদের হত্যা করলে কোনোরকম পাপ হয় না।

৮। বদ্ধজীবনে চারটি মূল পাপ কর্ম কি কি ?

উত্তর ঃ অবৈধ যৌনসঙ্গ, দ্যূত ক্রীড়া (জুয়া), নেশা, মাংসাহার।

৯। জড় বিষয় ভোগী ও ভগবৎ সেবা পরায়ন ভক্তের অবস্থাটি কি রকম ?

উত্তর ঃ

✤ জড় বিষয় ভোগকামী ✤	✤ ভগবৎ-সেবাপর ভক্ত ✤
মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের ধ্যান	চিন্ময় স্তরে স্থিতি, বুদ্ধির পূর্ণ সংযম
↓	↓
বিষয়ে আসক্তি	চিত্তের প্রসন্নতা
↓	↓
বিষয় লাভের জন্য কামনা	সর্ব দুঃখের নিবৃত্তি
↓	↓
কামনার বাধায় ক্রোধ	জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি ও দ্বেষ থেকে মুক্তি
↓	↓
ক্রোধ হতে সম্মোহ	ভগবৎ-কৃপা লাভ
↓	↓
স্মৃতিবিভ্রম	ভগবানে একনিষ্ঠ শরণাগতি
↓	↓
বুদ্ধিনাশ	ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় নিয়োগ
↓	↓
জড়জগতের অন্ধকূপে পতন	চিত্ত সংযত করে ভগবৎ-সেবায় কর্মানুশীলন

১০। জীবের (আত্মার) প্রকৃত সুখী হওয়ার উপায় কি?

উত্তর ঃ কেউ মনে করে পুঁজিবাদ
কেউ মনে করে সাম্যবাদ
কেউ মনে করে সমাজবাদ
কেউ মনে করে বৈষয়িকতা
কেউ মনে করে মানবতাবাদ
কেউ মনে করে জাতীয়তাবাদ

প্রকৃতপক্ষে পরমার্থবাদ অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার মাধ্যমে কৃষ্ণের প্রতি সুপ্ত ভালোবাসার জাগরণের দ্বারাই প্রকৃত সুখী হওয়া যায়।

বিশেষত ঃ এই কলিযুগে প্রতিনিয়ত—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"

— জপ করুণ আর সুখী হউন।

১১। বর্ণাশ্রম পদ্ধতিটি কি?

উত্তর ঃ ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট গুণ ও কর্ম অনুসারে মানবসমাজের শ্রেণী বিভাগ। সত্ত্বগুনে প্রভাবিত ভগবৎ-পরায়ন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষ ব্রাহ্মন হচ্ছে সমাজের সর্বোচ্চ স্তর। রজোগুনে প্রভাবিতে ক্ষত্রিয় বা প্রশাসক সম্প্রদায় সমাজের রক্ষক। রজো ও তমো প্রভাবিত বৈশ্য বা উৎপাদক শ্রেণী। আর তমো গুণে প্রভাবিত শূদ্র বা শ্রমজীবি সম্প্রদায়। অনুরূপভাবে পারমার্থিক

জীবনে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারটি আশ্রম অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হয়।

১২। অষ্ট সিদ্ধি কি কি ?

উত্তর ঃ অষ্টসিদ্ধি হচ্ছে —

অনিমা— এই সিদ্ধির প্রভাবে খুব ছোট হয়ে যাওয়া যায়

লঘিমা— এর প্রভাবে হাল্কা হয়ে যাওয়া যায়। ফলে অনায়াসে বায়ুতে বা জলে ভেসে থাকা যায়।

মহিমা — বিশাল আকার ধারণ করতে পারা যায়।

প্রাপ্তি— যোগী তাঁর হাতকে প্রসারিত করে যে-কোনো গ্রহলোক থেকে ইচ্ছামতো জিনিস সংগ্রহ করতে পারেন।

ঈশিতা— ইচ্ছার দ্বারা একটি সম্পূর্ণ গ্রহ সৃষ্টি করা বা ধ্বংস করা যায়।

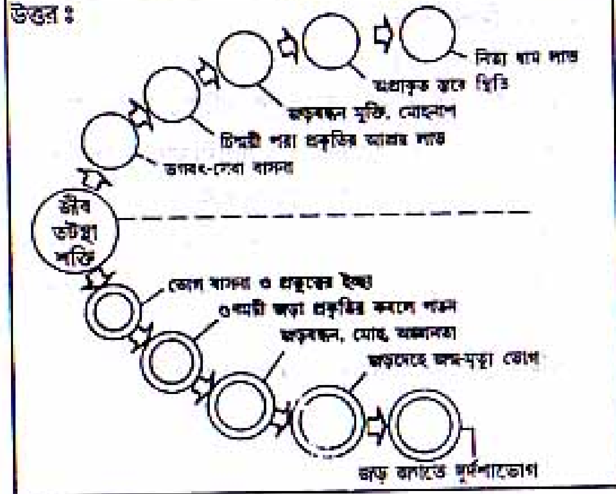
বশিতা— যে কোনো মানুষকে বশীভূত করা যায়।

প্রাকাম্য— মনের যে কোনো বাসনা পূর্ণ করা যায়। প্রকৃতিতে অদ্ভুত কর্ম সংঘটন করা যায়।

কামবশায়িতা— প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এটি এক রকমের যাদুবিদ্যা।

১৩। জীবের সীমিত স্বাধীনতার ব্যবহার অনুসারে দুরকম গতি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ



১৪। পরমার্থ বিদ্যার সঙ্গে পুঁথিগত জড়বিদ্যার পার্থক্য কি ?

জড়বিদ্যা	পরমার্থ বিদ্যা
১। স্কুল কলেজে প্রদত্ত রসায়ন, গণিত, প্রভৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, ইতিহাস, সাহিত্য কলাবিদ্যা সবই হচ্ছে জড় বিষয়ক বিদ্যা।	১। ভগবান ও জীবের স্বরূপ ও সম্পর্ক, জীবনের উদ্দেশ্য, আত্ম-উপলব্ধির বা ভগবৎ-উপলব্ধির উপায় প্রভৃতি পরমার্থ বিদ্যার অন্তর্গত।

জড়বিদ্যা	পরমার্থ বিদ্যা
২। লক্ষ্য জড়জ্ঞান অর্জন।	২। লক্ষ্য পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ।
৩। উদ্দেশ্য—জড় দেহকে তৃপ্ত করার আয়োজন করা, ভোগ তৃপ্তিময় পরিবেশ রচনা করা।	৩। আত্মাকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করে পুনরায় নিত্য আনন্দময় চিন্ময় পরিবেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।
৪। অর্জিত জ্ঞান অপূর্ণ, নৈমিত্তিক, ত্রুটিপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল।	৪। এই জ্ঞান পূর্ণ, নিত্য, অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয়।
৫। জড় জ্ঞান মানসিক জল্পনা কল্পনা নির্ভর, তাই গভীর সত্যের উপলব্ধি দান করতে পারে না।	৫। ভগবৎকৃপায় হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়। তা স্বতঃই আত্মস্বরূপ ও ভগবৎ স্বরূপের উপলব্ধি দান করে।

১৫। জীবের কষ্টের জন্য কৃষ্ণ দায়ী কি না ?

উত্তর ঃ না। সতন্ত্রতা জীবের একটি গুণবিশেষ। জীবের যদি স্বতন্ত্রতা না থাকত তা হলে তা জড়বস্তুর ন্যায় তুচ্ছ ও হেয় হত। নিত্যধর্ম থেকে বস্তুকে পৃথক করা যায় না। জীব যে পরিমানে ক্ষুদ্র তার স্বাধীনতাও তদ্রূপ ক্ষুদ্র। এই জীব যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে মায়ায় বদ্ধ হয়ে কষ্ট পায় তখন করুনাময় কৃষ্ণ তার

মঙ্গলের জন্য এই জগতে লীলা প্রকট করেন। তাও যখন জীব বুঝতে পারে না, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে স্বয়ং শিক্ষা দেন। এমন করুনাময় কৃষ্ণকে কখনোই দোষারোপ করা যায় না। জীব নিজের দোষেই কষ্ট পায়।

১৬। গুরু পরম্পরা কি?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে শ্রীব্রহ্মাকে তত্ত্বজ্ঞান দান করেন। ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাসদেব, ব্যাসদেব থেকে শ্রীমধ্বাচার্য............ এই ভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং পরবর্তীতে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এবং বর্তমানে শ্রীল অভয়-চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সেই তত্ত্ব শিক্ষা দান করেন। এই গুরু শিষ্য ক্রমে যে উপদেশ পাওয়া যায় তাই গুরু পরম্পরা।

১৭। বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের শিক্ষা আছে। তাহলে অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের কি হবে?

উত্তর ঃ অন্যান্য ধর্মে যে ঈশ্বর, ও পরমাত্মা ও ব্রহ্মের বিষয় বর্ণনা ও তাঁর আরাধনার পদ্ধতি, সে সবই প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করেই। জীবের ক্রমে ক্রমে শেষে কৃষ্ণভক্তি লাভ হবে। আংশিক ধর্ম অনুশীলন সম্পূর্ণতা লাভ করলে তা কৃষ্ণভক্তিতে পর্যবসিত হয়। জীবের চরম জ্ঞান হচ্ছে- শ্রীকৃষ্ণই পরমপুরুষোত্তম ভগবান ব্রহ্ম ও পরমাত্মারও উৎস।

১৮। প্রমাণ কি ? তা কত প্রকার ?

উত্তর ঃ যার দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাকে প্রমান বলে।

প্রমাণ তিনপ্রকার ঃ—

১) প্রত্যক্ষ (ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান)

২) অনুমান (প্রত্যক্ষ নিদর্শনের ভিত্তিতে তৈরী সিদ্ধান্ত মতবাদ)

৩) শব্দ (কোনো প্রামানিক কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে শ্রবণ)

১৯। কুলক্ষয় কি ? আধুনিক সমাজ কি এর কুফল থেকে মুক্ত ?

উত্তর ঃ বর্ণাশ্রম সমাজ ব্যবস্থায় অনেক রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া আছে যা পরিবারের প্রতিটি লোকের যথাযথ পারমার্থিক উন্নতিসাধনে সহায়তা করে। তাই সমাজের বুদ্ধিমান প্রবীন সদস্যদের মৃত্যু হলে মঙ্গলজনক পারিবারিক প্রথাকে রূপদেওয়ার মতো কেউ থাকে না, তখন বংশ বা কুলের অধঃপতন ও ধ্বংস হয়, তাই কুলক্ষয়। আধুনিক সমাজে এর কুফল অত্যন্ত প্রকট।

২০। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের থেকে কি অধিক গুরুত্বপূর্ণ? কেন?

উত্তর ঃ জড় পদার্থ, আত্মা ও ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করার চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

জড় দেহের জন্ম হয় এবং এক সময় না এক সময় তার বিনাশ হবেই, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর তার কখনই বিনাশ হয় না। তাই জড় দেহটি আত্মার মতো গুরুত্ব পূর্ণ নয়। সাধারণ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই দেহের বিনাশ

হবার ভয়ে শোক করা নিতান্তই মূর্খতা। তাই পরম সত্য সম্পর্কে অবগত প্রকৃত জ্ঞানী সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে ভগবানের শরনাগত হয়ে পরাগতি লাভ করেন।

২১। জীব, দেবতারাও কিভাবে ঈশ্বর? তাঁরা কি শ্রীকৃষ্ণের সমতুল? উভয়ের তুলনা করুন।

উত্তর : জীবকুল বা দেবতারাও একরকমের ঈশ্বর। জড়জগতের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের পরিচালনাধীন যে প্রশাসন ব্যবস্থা বা 'সরকার' রয়েছে, দেব দেবীরা হচ্ছেন সেই সরকারের বিভিন্ন পর্দস্থ কর্মাধ্যক্ষ বা তত্ত্বাবধায়ক। ভগবানের দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত সব দেব দেবী বা ক্ষমতা সম্পন্ন জীব নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঈশ্বর বা নিয়ন্তা কিন্তু তারা পরম ঈশ্বর বা অন্তিম নিয়ন্তা নন। একমাত্র কৃষ্ণই পরমেশ্বর বা পরমাত্মা। তিনি বাইরে ও অন্তরে উভয়স্থানেই বিরাজমান।

না, জীব ও দেবদেবী গণ - সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছাধীন। কিন্তু ভগবান স্বতন্ত্র। সবকিছুর মূল ভগবানকে সন্তুষ্ট করলে সকলের পূজা হয়, কিন্তু শাখারূপ দেবতাদের পূজা করলে তা হয় না। দেবতাদের প্রদত্ত ফল অস্থায়ী কিন্তু ভগবানের প্রদত্ত ফল নিত্য। দেবতাদের পূজকদের অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে সবকিছু কৃষ্ণের জন্য। দেবপূজা অবিধিপূর্বক কৃষ্ণের পূজা।

২২। সপ্তমাতা কে কে ?

উত্তর : নিজের মা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মনী, রানীমা, গাভী, ধাত্রী ও পৃথিবী- এই সাতজন মাতা বলে পরিচিত।

২৩। দিব্য ভাব সম্পন্ন ব্যক্তির গুণসমূহের নাম উল্লেখ কর।

উত্তর : অভয়তা, সত্ত্বার পবিত্রতা, পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলন, দান, আত্মসংযম, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, তপশ্চর্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্যবাদিতা, ক্রোধশূণ্যতা, বৈরাগ্য, শান্তি, অন্যের দোষ না দেখা, লোভশূণ্যতা, মৃদুতা, অসৎচিন্তা ও অসৎ কর্মে লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শৌচ, মাৎসর্যশূণ্যতা, অনভিমান এই সমস্ত গুনগুলি দিব্য ভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়।

২৪। অসুরস্বভাব ব্যক্তিদের গুণাবলী বর্ননা কর।

উত্তর : দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কর্কশ বাক্য, অবিবেক, অসৎ, অশৌচ, মিথ্যা অহংকার, বুদ্ধিহীন, মদমত্ত, বিদ্বেষপরায়ণ, ক্রূর, অসৎব্যবহার, লক্ষ্যহীন, অনিত্যের প্রতি আকৃষ্ট, ইন্দ্রিয় ভোগে লিপ্ত, উৎকণ্ঠাপূর্ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ, প্রকৃতধর্মের (সনাতন ধর্মের) নিন্দা, শাস্ত্রবিধি-অমান্য করা ইত্যাদি আসুরিক গুন সম্পন্ন নরাধমদের ভগবান বার বার নরকে নিক্ষেপ করেন।

২৫। বিশ্বে কারা সর্বশ্রেষ্ঠ দানবীর বলে পরিচিত?

উত্তর : বলি— সমস্ত রাজ্যসহ নিজেকে বামন দেবের নিকট অর্পণ

করেছিলেন।

কর্ণ — তার সহজাত কবচকুন্ডল ব্রাহ্মণকে দান করেন।

হরিশ্চন্দ্র — সত্যরক্ষার জন্য সমস্ত রাজ্য দান করেন।

রন্তিদেব — ক্ষেত থেকে শস্যকণা কুড়িয়ে জীবন ধারণ করেও সত্যরক্ষা করেন।

শিবি— একটা পায়রাকে রক্ষা করতে নিজের জীবনপর্যন্ত দান করতে প্রস্তুত ছিলেন।

২৬। স্বধর্ম দু'রকমের — কি কি ?

উত্তর ঃ (১) দেহধর্ম (বর্ণাশ্রম)
(২) আত্মধর্ম বা স্বরূপগত ধর্ম।

জড়বন্ধন মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জীবকে শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী তার দেহের ধর্ম পালন করতে হয় এবং তারফলে সে জড়বন্ধন মুক্ত হয়। মুক্ত অবস্থায় জীব তার অপ্রাকৃত স্বরূপে (আত্মস্বরূপে) অধিষ্ঠিত থাকে। তখন আর তার দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না। তাই তখন তাকে জড়জাগতিক অথবা দেহগত আচার অনুষ্ঠান করতে হয় না।

২৭। মায়ার সবচেয়ে কঠিন ফাঁদ কি ?

উত্তর ঃ জড়াপ্রকৃতিতে জীবাত্মা তাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং নিজেকে ভোক্তা মনে করে। এই বিকৃত মনোবৃত্তির সবচেয়ে অধঃপতিত অবস্থার প্রকাশ হয়, যখন তারা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাবার বাসনায় মুক্তি কামনা

করে এবং তার পরিনতিতে নিজেদেরকেই ভগবান বলে জাহির করতে চেষ্টা করে। এটাই হচ্ছে মায়ার সবচেয়ে কঠিন ফাঁদ-- কারণ তথাকথিত মুক্তিকামীরা মায়ামুক্ত হতে গিয়ে মায়ার সবচেয়ে জটিল ফাঁদে আটকে যায়।

২৮। জড়জগতের প্রতিটি ক্রিয়ার কেন প্রতিক্রিয়া হয় ? তার ফল কি?

উত্তর ঃ জড়াপ্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে জড়জগতের প্রতিটি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়া বা কর্মফল জীবকে জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। বেদ সাধারণত সকাম কর্ম করার শিক্ষা দান করে, যার ফলে সাধারণ মানুষ নিয়ন্ত্রিত জড় সুখ উপভোগ করে, জড় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করে, জড়প্রকৃতিকে অতিক্রম করে অধোক্ষজে উত্তীর্ণ হতে পারে।

২৯। কার কাছে বেদ, উপনিষদ ও কর্মকান্ডীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের প্রয়োজন নেই?

উত্তর ঃ বেদ উপনিষদ আদি শাস্ত্রে যে সমস্ত তপশ্চর্যা, যাগযজ্ঞ, বিধিনিষেধ আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভগবানের কৃপা লাভ করে তার পদারবিন্দে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করা। তাই ভগবানের সেবায় যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তাকে আর সেই সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের শরণ নিতে হয় না। যে মানুষ ভগবদ্ভক্তি লাভ করেছেন, তিনি শব্দ-ব্রহ্মের স্তর উত্তীর্ণ হয়েছেন, অর্থাৎ তার কাছে বেদ উপনিষদের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

৩০। ইন্দ্রিয় কি? তারা কিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়? আকৃষ্ট হলে ক্ষতি কি?

উত্তর ঃ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যা বাহ্য জড় বিষয়ের সংস্পর্শে সংবেদন সৃষ্টি করে, কর্মসম্পাদনে সাহায্য করে। তারা জড় পদার্থ ভোগে আকৃষ্ট হয়। আকৃষ্ট হলে জড় জগতের অন্ধকূপে পতিত হতে হয়। ভগবদ্‌গীতার বর্ণনা অনুযায়ী—মনে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সমূহের চিন্তা → আসক্তি → কামনার উদয় → বাধায় ক্রোধ → সম্মোহ → স্মৃতি বিভ্রম → বুদ্ধিনাশ → বিনাশ (জড় জগতের অন্ধকূপে পতন)

৩১। সম্পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার জন্য কতটা সময় প্রয়োজন? দৃষ্টান্ত দিন।

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণভাবনাময় অর্থাৎ ভগবৎ-পরায়ণ দিব্য জীবন এক মুহূর্তের মধ্যে লাভ করা সম্ভব, আবার লক্ষ কোটি জীবনেও তার নাগাল পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এই জীবন লাভ করতে হলে কেবল পরম সত্যকে উপলব্ধি করে তাকে গ্রহণ করতে হবে। খট্বাঙ্গ মহারাজ তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক মুহূর্ত পূর্বে ভগবানের চরণারবিন্দে আত্মোৎসর্গ করার ফলে জীবনের সেই পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলেন।

৩২। স্বার্থপর কর্ম কি এবং বৈরাগ্য কি?

উত্তর ঃ সৎ কর্ম করে। অহিংসা ব্রত পালন করে ভাল মানুষ হওয়াটাই স্বার্থপর কর্ম, কিন্তু সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, ইচ্ছা, অনিচ্ছার বিচার না করে ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করাটাই হচ্ছে বৈরাগ্য। এটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম।

৩৩। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কে? তাঁর অবতরণ সম্পর্কিত শ্রীমদ্ভাগবতের ভবিষ্যদ্বাণীটি কি?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (রাধা-কৃষ্ণের মিলিত প্রকাশ রূপে অবতীর্ণ)। তিনি এই কলিযুগে সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করেন। সেই সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতের ভবিষ্যদ্বাণীটি হল—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ।।

"এই কলিযুগে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মনীষিরা সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা পার্ষদযুক্ত ভগবান শ্রী গৌর হরির আরাধনা করবেন।"

এছাড়াও মহাভারত, চৈতন্যোপনিষদ, অথর্ববেদ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান।

৩৪। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত অনুসারে একজন আদর্শ শিক্ষক কেমন হবেন ?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, শিক্ষা দেওয়া শুরু করার আগে থেকেই শিক্ষকের সঠিকভাবে আচরণ করা উচিত। এভাবে যিনি শিক্ষা দেন, তাকে বলা হয় আচার্য অথবা আদর্শ শিক্ষক। তাই জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষককে অবশ্যই শাস্ত্রের আদর্শ

অনুসরণ করে চলতে হয়। কেউ যদি শাস্ত্র বহির্ভূত মনগড়া কথা শিক্ষা দিয়ে শিক্ষক হতে চায়, তাতে কোনো লাভ তো হয়ই না বরং ক্ষতি হয়।

৩৫। 'ভগবানের আচরণ অনুসরণ করা উচিৎ, অনুকরন করা উচিৎ নয়'— কেন ?

উত্তর ঃ ভগবান এবং তাঁর শক্তিতে শক্তিমান ভক্তদের নির্দেশ সকলের অনুসরণ করা কর্তব্য। তাঁদের দেওয়া উপদেশ আমাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করে এবং যে মানুষ বুদ্ধিমান, সে যথাযথ ভাবে এই সমস্ত উপদেশগুলিকে পালন করে। কিন্তু আমাদের সব সময় সতর্ক থাকা উচিৎ যাতে আমরা কখনও তাঁদের অনুকরণ না করি। দেবাদিদেব মহাদেবকে অনুকরন করে বিষ পান করা আমাদের কখনোই উচিৎ নয়।

ভগবানকে অনুকরণ না করে তাঁকে অনুসরণ করাটাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য ভগবান যা উপদেশ দিয়েছেন, তা পালন করলেই আমাদের পরমার্থ সাধিত হবে। কিন্তু তা না করে, যদি আমরা নিজেরাই ভগবান সাজতে চাই, তা হলে আমাদের অধঃপতন অনিবার্য। লোক ঠকাবার জন্য অনেক ভন্ড নিজেদের ভগবানের অবতার বলে প্রচার করে, কিন্তু সর্বশক্তিমান ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার কোনো চিহ্নই তাদের মধ্যে দেখা যায় না।

৩৬। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন আর কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপনের পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে বিষয়ভোগ করার ফলে মানুষ জড়বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করলে আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের দ্বারা আবদ্ধ হতে হয় না। যাদের কৃষ্ণভাবনার উদয় হয়েছে তাদের আর জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনা থাকে না,

৩৭। কেন স্বধর্ম পালন করা প্রয়োজন ?

উত্তর ঃ পরধর্ম পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে, স্বধর্ম আচরণ করাই মানুষের কর্তব্য। প্রকৃতির গুণ অনুসারে শাস্ত্র নির্দেশিত ধর্মাচরণগুলি মানুষের দেহমনের বৈশিষ্ট অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে। সদগুরু যে আদেশ দেন তাই হচ্ছে পারমার্থিক কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পাদন করার মাধ্যমে আমরা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবা করে থাকি। মানুষ যখন জড়া প্রকৃতির দ্বারা কবলিত থাকে তখন তার কর্তব্য হচ্ছে, তার বিশেষ অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট বিধান পালন করা। যেমন ব্রাহ্মণ, অহিংসাপরায়ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রয়োজনে হিংসার আশ্রয় নিতে পারেন।

৩৮। জীবের সর্বপ্রধান শত্রু কে ? কেন ?

উত্তর ঃ কাম হচ্ছে জীবের সর্বপ্রধান ও বড় শত্রু। কেননা তা শুদ্ধ চেতনা আচ্ছাদনকারী, জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশক।

৩৯। ধর্ম ও অধর্ম কি ?

উত্তর ঃ ভগবানের আইনই হচ্ছে ধর্ম। ধর্মের তত্ত্ব বেদে নির্দেশিত হয়েছে এবং বেদের এই নির্দেশগুলির যথাযথ আচার না করাটাই হচ্ছে অধর্ম। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে ভগবান নিজেই কেবল ধর্মের সৃষ্টি করতে পারেন। বেদ ভগবানেরই বাণী এবং ব্রহ্মার হৃদয়ে তিনি এই জ্ঞান সঞ্চার করেন। তাই ধর্মের বিধান হচ্ছে সরাসরিভাবে ভগবানের আদেশ (ধর্ম তু সাক্ষাদ্-ভগবৎ প্রণীতম্)।

৪০। কেউ অবতার বা ভগবান কিনা তা কিভাবে নির্ধারণ হওয়া উচিত?

উত্তর ঃ ভগবৎ ধাম থেকে এই জড়জগতে প্রকট হবার ফলে ভগবান বা ঈশ্বরমূর্তি অবতার নাম ধারণ করেন। এই অবতারেরা অপ্রাকৃত পরব্যোমে অবস্থান করেন। প্রাকৃত জগতে অবতরন করার জন্য তাঁকে অবতার বলা হয়। ভগবানের অনেক রকম অবতার—পুরুষাবতার গুণাবতার, লীলাবতার, শক্ত্যাবেশ অবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতার। প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই তা নির্ধারিত আছে।

৪১। কিভাবে জড়জগতের উপাদান ও জড় শরীর, মন দিয়ে কর্ম সম্পাদন করলেও সেই কর্ম চিন্ময় হয়ে ওঠে ?

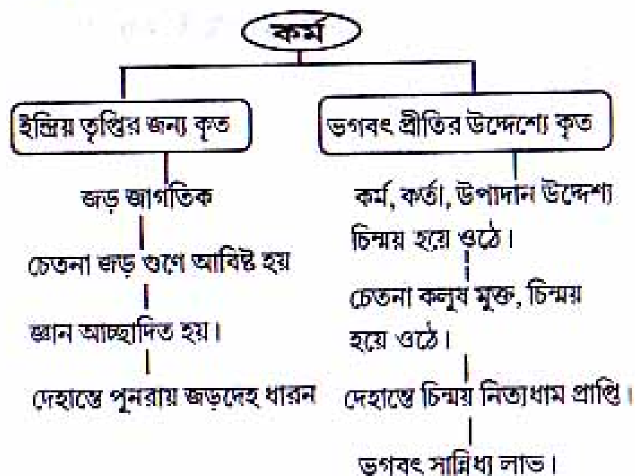
উত্তর ঃ যখন ভগবদ্ভাবনায় ভাবিত হয়ে আমরা ভগবানের চরনে

কোনো কিছু উৎসর্গ করি। তখন অর্পন, হবি, অগ্নি, হোতা ও ফল (যা আপত জড় উপাদান বলে প্রতিভাত)অথবা ভগবানের প্রসাদ রূপে কোনো কিছু গ্রহন করি, তখন তা সবই ব্রহ্মময় বা চিন্ময় হয়ে ওঠে।

৪২। আধ্যাত্মিক কর্মের দুটি স্তর কি কি ?

উত্তর ঃ পারমার্থিক কর্মের দুটি স্তর হচ্ছে নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করা এবং পরমপুরুষোত্তম ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করা

৪৩। কেবল মানসিকতার প্রভেদে কর্মের দু'রকম গতি বর্ণনা কর।



৪৪। সর্বজীবে সমদর্শিতার সুত্রটি কি?

উত্তর ঃ বৈষ্ণব ধর্ম কাউকে ঘৃণা করতে শেখায় না। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষন করেছেন যে যার মধ্যে যথার্থ জ্ঞান উদিত হয়, তিনি একজন বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, কুকুর, হস্তি, গাভী ও চন্ডালকে সমদৃষ্টিতে দেখেন। প্রতিটি জীব শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে ভগবান বিরাজ করছেন। শুধুমাত্র জীব চেতনার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে।

কৃষ্ণভাবনাময় অবস্থা হচ্ছে চেতনার বিবর্তনের চরম পর্যায়-পূর্ণ বিকশিত রূপ।

৪৫। এই কলিযুগে যোগ সাধনার শ্রেষ্ঠ পন্থাটি কি ও কেন?

উত্তর ঃ এই কলিযুগে যোগ সাধনার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা এবং এই যোগ সাধনা ব্যর্থ হয় না। ভগবদ্ভক্তি সাধন করবার মাধ্যমে ভক্ত যে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করে তার ফলে তিনি আর কোনো রকম জড় সুখভোগ করার আকাঙ্খা করেন না। শঠতাপূর্ণ এই যুগে হঠযোগ, ধ্যানযোগ ও জ্ঞানযোগ অনুশীলনের পথে অনেক বাধাবিপত্তি আছে, কিন্তু কর্মযোগ অথবা ভক্তিযোগ অনুশীলনে তেমন কোনো অসুবিধা নেই।

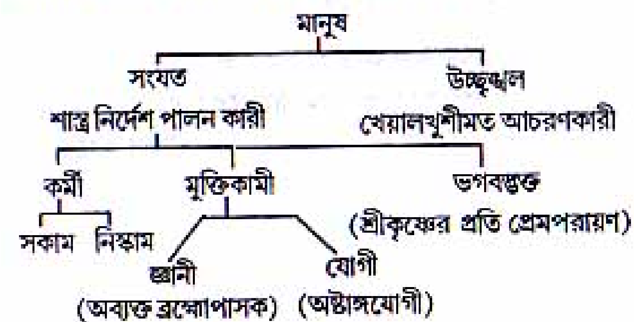
৪৬। ভক্তিযোগে সাফল্য লাভের ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

উত্তর ঃ "এক সময় না এক সময় সাধনায় সিদ্ধি অবশ্যই হবে"

এভাবে পূর্ণ আশাবাদী হয়ে গভীর ধৈর্য্য সহকারে ভক্তিপথ অনুসরণ করতে হয়। সাফল্যলাভে বিলম্ব হলে হতোদ্যম হওয়া কখনই উচিৎ নয়। কারন দৃঢ়সংকল্প নিয়ে যিনি যোগাভ্যাস করেন, তিনি অবশ্যই সাফল্য লাভ করেন। রূপগোস্বামী বলেছেন—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম-প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তি প্রসিধ্যতি।।

৪৭। সাধারণভাবে মানুষের শ্রেণীবিভাগ কর।



৪৮। বল ও কাম কখন ধর্মানুগ ?

উত্তর ঃ যে বলবান তার কর্তব্য হচ্ছে দুর্বলকে রক্ষা করা। তেমনই, কাম বা যৌন জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মপরায়ন সন্তান উৎপাদন করা। তখনই তা ধর্মানুগ। কেননা বলবানের কাম ও রাগ বিবর্জিত বল এবং ধর্মের অবিরোধী কাম হচ্ছে ভগবানেরই প্রকাশ।

৪৯। বিজ্ঞানীদের বুদ্ধির উৎস কি ?

উত্তর : গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন - যে তিনিই সমস্ত বুদ্ধির উৎস। তাই বিজ্ঞানীদের বুদ্ধির উৎসও তিনি, যে বুদ্ধি ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না।

৫০। জীবনের শেষে কিভাবে সার্থকতা অর্জন করা যায় ?

উত্তর : জীবনের শেষে সার্থকতা অর্জন করতে হলে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ অপরিহার্য। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে মনে রাখতে হলে সর্বক্ষণ অবিরামভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র —

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

কীর্তন করতে হয়।

৫১। শুদ্ধভক্তের বিশেষ গুণটি কি ?

উত্তর : শুদ্ধভক্তের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে যে, তিনি স্থান-কাল বিবেচনা না করে অবিচলিত ভাবে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন। ফলে তার কাছে কোনো বাধাবিঘ্ন আসতে পারে না।

৫২। ভক্তিযোগীর পাঁচটি প্রকার ভেদ কি ?

উত্তর : ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকার ভাব অনুসারে ভক্তিযোগী পাঁচ প্রকার—

(১) শান্তভক্ত— নিরপেক্ষ উদাসীনভাবে ভগবানের সেবা করেন।
(২) দাস্য ভক্ত— দাস্যভাবে ভগবানের সেবা করেন।
(৩) সখ্য ভক্ত— ভগবানকে সখারূপে সেবা করেন।

(৪) বাৎসল্যভক্ত— পিতা অথবা মাতারূপে ভগবানের সেবা করেন।
(৫) মাধুর্যভক্ত — ভগবানের প্রেয়সীরূপে তাঁর সেবা করেন।

৫৩। বিভিন্ন কালে দেহত্যাগে যে ভিন্ন ভিন্ন গতি হয় তা লিখুন।

দেহত্যাগের সময়	গতিলাভ
(ব্রহ্মবিদ্‌গণের ক্ষেত্রে) অগ্নি, জ্যোতি, শুভদিন ও উত্তরায়ণ	ব্রহ্মজ্যোতি
(সকাম কর্মী) ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণের ছয়মাস	চন্দ্রলোকে গমন পরে মর্তে প্রত্যাবর্তন
(বৈদিক মত) ১। শুক্ল মার্গে দেহত্যাগ	জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।
২। কৃষ্ণ মার্গে	পুনরায় জড়জগতে ফিরে আসতে হয়।
উভয় মার্গকে ক্লেশকর জেনে সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় নিয়োজিত থাকা।	আদি, শাশ্বত, পরম ধামে ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ।

৫৪। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার সীমাবদ্ধতা কোথায় ?

উত্তর : বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কেবল বাহ্যিক জ্ঞানের মধ্যেই

সীমিত। জাগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে মানুষ রাজনীতি, সমাজনীতি, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, যন্ত্র-বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানে চিন্ময় আত্মার তত্ত্ববিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় না অথচ এই দেহে আত্মার মাহাত্ম্যই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আত্মাবিহীন দেহ মৃত।

৫৫। পুণ্য তিথিতে কেন উপবাস করা উচিৎ?

উত্তর ঃ ভক্তিযোগের কতগুলি ক্রিয়া অবশ্য পালনীয়, যেমন একাদশী, জন্মাষ্টমী আদি পূন্য তিথিতে উপবাস করা। এই সমস্ত বিধি বিধান মহান অচার্যদের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। যারা চিন্ময় জগতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে প্রকৃত প্রয়াসী তারা অবশ্যই নিষ্ঠা সহকারে এগুলি পালন করবেন। এই সমস্ত বিধি বিধান কঠোরভাবে পালন করলে অবধারিত ভাবে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায়।

৫৬। বদ্ধাবস্থায় আমরা মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে জীব ও জগতকে দেখি সবকিছু ভ্রান্ত বিকৃত ভাবে। প্রকৃত জ্ঞানময় দর্শন কেমন ?

উত্তর ঃ আমরা সকল জীবের কেবল জড় দেহ দেখি। কিন্তু জড়দেহই সব নয়। দেহে অবস্থান করছেন দু'জন পুরুষ জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জড়দেহটি জীবাত্মার কর্মক্ষেত্র মাত্র। জীবাত্মা ও পরমাত্মা হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞ। দেহটি ২৪টি প্রাকৃতিক উপাদানের সমন্বয়। গুণ প্রভাবে সঞ্চালিত হয়। বিভিন্ন জীবে যে ভেদ দেখি, তা কেবল দেহ পোশাকের, চিন্ময় আত্মা সেগুলিকে অনুভূতিশীল করছে। এইভাবে দেখাই প্রকৃত দর্শন; ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব,পরমক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা ও প্রকৃতিকে পৃথকভাবে জানাই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রভাবে ভক্ত কৃষ্ণের মত চিন্ময় প্রকৃতি লাভ করেন এবং ভগবদ্ধামে গমন রূপ পরমগতি লাভ করেন।

৫৭। এ জগতে বদ্ধজীব কেন বিকৃতস্বভাব, সেবাবৃত্তিশূণ্য ?

উত্তর ঃ ভগবদ্ধামে শুদ্ধজীব দিব্য ভগবৎপ্রেমে আবিষ্ট হয়ে ভগবৎসেবায় তৎপর। জড়া প্রকৃতিতে বদ্ধ অধঃপতিত জীবের কার্যকলাপ ভগবৎ-প্রেমলেশহীন, স্বার্থপর, ইন্দ্রিয়গত। কারণ জড়াপ্রকৃতির তিনটি গুণ বদ্ধজীবের চেতনাকে আবিষ্ট করেছে স্বভাবকে বিকৃত করেছে। বদ্ধজীবের কর্মনিষ্ঠা সত্ত্ব, রজ, তমগুণের প্রভাবে উৎপন্ন। নিজের চেষ্টায় গুনমুক্ত হওয়া যায় না। ভগবৎসেবা গুণকলুষহীন চিন্ময়; তাই কেবল অব্যাভিচারী ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবার প্রভাবে নিত্য চিন্ময় স্বরূপাবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৫৮। এই জড়জগৎ আসলে কি ? বদ্ধজীব এখানে কি করছে? মুক্তজীবের অধিষ্ঠান কোথায় ? পুরুষোত্তম কে?

উত্তর ঃ জড়জগৎ উর্দ্ধমূল বৃক্ষের মতো— চিন্ময় জগতের প্রতিফলন। জীব এখানে প্রকৃতির রূপ রসাদি বিষয় ভোগ করছে, এবং ক্রমাগত একদেহ হতে অন্য দেহে দেহান্তরিত হয়ে চলেছে— এজন্য এদের বলা হয় ক্ষর। কিন্তু এই ভোগের জন্যও তারা

পরমেশ্বরের কৃপার উপর নির্ভরশীল। তিনিই গ্রহমন্ডল ধারণ করেছেন, সূর্য চন্দ্রাদির মাধ্যমে তেজ বিকিরন করছেন, জীবকে প্রয়োজনীয় স্মৃতি জ্ঞান দান করছেন। কিন্তু চিদ্‌জগতে আরেক ধরণের জীব রয়েছে। যারা জরা মরনহীন, অক্ষয়। পুরুষোত্তম ভগবান বদ্ধ বা মুক্ত, ক্ষর ও অক্ষয় সমস্ত পুরুষের মধ্যে মহত্তম এবং এই তত্ত্ব উপলব্ধি করলে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করা যায়। যিনি তা জানতে পারেন তিনি সর্ববিদ সবকিছু জানেন, তিনি বুদ্ধিমান। তিনি সার্থকতা লাভ করেন।

৫৯। কারা পুরুষোত্তম ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবায় নিয়োজিত হন? কারাই বা তা অস্বীকার করেন? উভয়ের লক্ষণ কি?

উত্তর ঃ যারা দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত, তারা পুরুষোত্তম ভগবান কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করেন এবং জড়জগৎ রূপ প্রতিবিম্ব বৃক্ষটি থেকে মুক্ত হন। তাঁরাই কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবায় নিয়োজিত হন। কিন্তু যারা দম্ভ, দর্প, ক্রোধ, মৎসরতা প্রভৃতি অসদগুনাবলী বিশিষ্ট, তারা অসুর স্বভাব, শৌচ সংস্কৃতি বর্জিত এই সমস্ত অহংকারী ভোগাসক্ত মানুষ কখনো ভগবানের শরণাগত হয় না, বরং তারা নাস্তিকতাবাদ, জড়বাদ প্রচার করে। প্রকৃত ধর্মের নিন্দা করে। তারা জীবনব্যাপী ইন্দ্রিয়ভোগের ব্রত গ্রহণ করে এবং নিজেকে ঈশ্বর ভোগী বলে জাহির করে, তাদের উগ্রকর্ম জগতের ক্ষয় ও অহিত সাধন করে। এভাবে তারা

জড়জগতের গভীরতম অন্ধকূপে নিমজ্জিত হয় অশুচি নরকে পতিত হয়। তারপর তারা বারবার পশুযোনী অসুর যোনিতে নিক্ষিপ্ত হয়। তাই শাস্ত্রবিধি মেনে জীবন যাপন করা কর্তব্য, খেয়াল খুশীমত জীবন যাপনের পরিনতি ভয়াভয়।

৬০। সকলেই কেন স্বয়ং ভগবানের উপাসনা করেন না? বহুদেব দেবীর উপাসনায় মানুষ কেন লিপ্ত হয়?

উত্তর ঃ জড়জগতে সমস্ত জীবই জড়াপ্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জীব বিভিন্ন গুণ-সঙ্গ প্রভাবে বিভিন্ন ধরণের স্বভাব লাভ করে থাকে। গুণ প্রভাবের মাত্রাধিক্য অনুসারে বিভিন্ন ধরণের শ্রদ্ধার উদয় হয়। আর শ্রদ্ধার প্রকৃতি অনুসারে উপাসনা পদ্ধতি, তপশ্চর্যা ও উপাস্যের তারতম্য ঘটে। যেমন কেউ নিরাকার অব্যক্তের প্রতি, কেউ গাছ পাথরের প্রতি, কেউ মায়াদেবীর রূপ কালী প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। গুণমুক্ত অবস্থায় প্রত্যেকেই কেবল কৃষ্ণের সেবক। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় গুণের প্রভাবে শ্রদ্ধা বিকৃত হয়েছে। তাদের পূজা, আরাধনা তপস্যা সবই সত্ত্ব, রজ ও তম — এই তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত। কোনো মানুষ যখন তার সমস্ত কর্ম পরমেশ্বর ভগবানকে অর্পণ করেন, তখন তার কর্ম সৎ হয়ে ওঠে, কিন্তু ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাহীন সকল কর্ম অসৎ, নিষ্ফল অর্থাৎ ভগবৎ সম্পর্কশূন্য সমস্ত উপাসনা তপস্যা দান ইত্যাদি কেবল বদ্ধজীবনের বৃদ্ধি করে থাকে।

৬১। কে শাস্ত্রের রহস্য জানতে পারে?

উত্তর ঃ যার গুরু-কৃষ্ণের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতি আছে। সেই ভক্তই শাস্ত্ররহস্য জানতে পারে। শ্রুতিতে উল্লেখ আছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন ।।"

সেই সব মহাত্মাগন, যাদের গুরু ও ভগবানে পরাভক্তি রয়েছে। কেবল তাঁদের কাছেই বৈদিক জ্ঞানের সমস্ত তাৎপর্য অর্থাৎ শাস্ত্রের রহস্য স্বতই প্রকাশিত হয়।

৬২। ভগবান কৃষ্ণ কার প্রার্থনা শোনেন ?

উত্তর ঃ ষড়স শরণাগতি হইবে যাহার।
তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।।

দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরন, কৃষ্ণ অবশ্যই রক্ষা করবেন এই বিশ্বাস, ভক্তিপ্রতিকূল বর্জন ও ভক্তি অনুকূল স্বীকার — এই ছয় প্রকারে শরনাগত ভক্তের প্রার্থনা ভগবান শোনেন।

হে কৃষ্ণ, আমি আপনার নিকট থেকে আমার নিজের কোনো সুখ চাই না। আপনা যা ইচ্ছা তাই শিরোধার্য। এরূপ আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা বিশিষ্ট হলেই কৃষ্ণ তাঁর সেবকের নিবেদন গ্রহণ করেন।

৬৩। অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যে বৈশিষ্ট কি ?

উত্তর ঃ যেমন আনুগত্য ও তোষামোদ এক নয়, তদ্রুপ অনুসরণ ও অনুকরণও এক নয়। যাত্রার দলের নারদ সাজা —অনুকরণ,

আর শ্রী নারদের প্রদর্শিত ও আচরিত ভক্তি পথে গমন অনুসরণ। কৃত্রিমভাবে নকল করার নাম অনুকরন, আর সত্য সত্য মহাজনের পথে গমন —অনুসরণ। অনুসরন নিজের আচরণ আর অনুকরন বিকৃত প্রতিফলন নামক একটা ব্যাপার।

৬৪। নাস্তিকের পরিণাম কি?

উত্তর ঃ নাস্তিকেরা জগতে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। দিনকতক তারা লাফালাফি করে পরিশেষে দৈব প্রভাবে ঠান্ডা হয়ে যায়। বৈষ্ণব বিদ্বেষ ফলে নাস্তিকের ঐহিক (জীবদ্দশায়) ও পারত্রিক (মৃত্যুরপরে) অমঙ্গল ঘটে।

৬৫। কামের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় কি ?

উত্তর ঃ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।

জড় জগতে কৃষ্ণসেবকই কৃষ্ণপ্রেম বিরোধী কামের হাত থেকে পরিত্রাণকারী। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তর্পন আত্মার একমাত্র বৃত্তি। কৃষ্ণ শরণাগতি বা কৃষ্ণসেবাই কামরোগের একমাত্র প্রতিষেধক।

৬৬। সংশয়াত্মার কি মঙ্গল হয়?

উত্তর ঃ না, সংশয়াত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সমস্তকিছুর পরমভোক্তা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, বিপরীত বিচার পরায়ণ ব্যক্তির দুর্ভাগ্যক্রমে সন্দেহের উৎপত্তি এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার অভাব।

৬৭। সেবা কি অবশ্য করণীয় ?

উত্তর ঃ আমাদের কর্তব্য গুরু-কৃষ্ণের সেবা করে যেতে হবে। এখন কৃষ্ণের যা ইচ্ছা তাই হবে। কৃষ্ণ যাকে যখন যেরূপ মতি দেন। আমাদের তাই স্বীকার্য। লোকলজ্জার ভয়ে শ্রীরাধারাণী কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না।

৬৮। ভক্তগণ গৃহে বা আশ্রমে (মঠে) কিভাবে থাকবেন ?

উত্তর ঃ কি মঠবাসী ভক্ত। কি গৃহস্থ ভক্ত সকলেই বাহিরে বিষয়ীপ্রায় থেকে অন্তরে ভক্তি নিষ্ঠা রাখবেন। অন্তরে বিষয়াশক্ত, গৃহাসক্ত বা প্রতিষ্ঠাকামী হওয়া কপটতা-তা ভক্তিবাধক। মহাপ্রভুর আদর্শ ও শিক্ষাই আমাদের গ্রহণীয়।

"মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।।
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।।"

৬৯। ধর্ম কি মানুষের সৃষ্টি ?

উত্তর ঃ কখনই না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে —

ধর্মন্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ প্রণীতম

যথার্থ ধর্মনীতি প্রণীত হয়েছে পরমপুরুষ ভগবানের দ্বারা। অধোক্ষজ শ্রীহরিতে ভক্তিই সেই ধর্ম। এতদ্ব্যতিত অন্যান্য মনঃকল্পিত যে সকল ধর্ম জগতে প্রচারিত হয়েছে বা হচ্ছে সেগুলি অনিত্য। সেগুলি আচরণ করে যথার্থ মঙ্গল হয় না।

৭০। ভক্তি ও অভক্তি কি ?

উত্তর ঃ ভক্তি বলতে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি প্রেমভক্তি (এককথায় কৃষ্ণসেবা) অভক্তি বলতে অন্যাভিলাষ, কর্ম,জ্ঞান যোগ এবং তাদের মিশ্রনে অনেক প্রকারে কৃষ্ণ বিমুখতা।

৭১। দেহ ধর্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম ও আত্মধর্ম কাকে বলে? কোনটি শ্রেষ্ঠ ?

উত্তর ঃ দেহকে নিজের, স্বরূপ মনে করে দেহের জন্য যে সকল কার্য সম্পাদিত হয় তাই দেহ-ধর্ম। এই প্রকার দেহসর্বস্ব ব্যক্তিদের ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের অতীত যে চিদানন্দ সুখ রয়েছে। সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই।

যে সকল কর্ম কোনো নিমিত্তকে আশ্রয় করে নিত্যকর্মের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তাই নৈমিত্তিক ধর্ম। যেমন পিতামাতার প্রতি কর্তব্যাচরণ প্রভৃতি এবং পাপ কর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্যের বিধান —এই সকল নৈমিত্তিক ধর্ম।

যখন কেউ জানতে পারে যে আমি এই দেহ নই। আমি হচ্ছি আত্মা, যা হচ্ছে সৎ, চিৎ ও আনন্দময় ও ভগবান কৃষ্ণের অংশ তখন সে আত্মধর্মে অধিষ্ঠিত হয়। নিজের কল্যাণের জন্য সে তখন নিরন্তর ভগবান কৃষ্ণের সেবায় রত থাকে। আত্ম-ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ, যা সমগ্র জীবের সনাতন ধর্ম।

৭২। সনাতন ধর্মের সারাংশ কি?

উত্তর ঃ কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করাই সনাতন ধর্ম। শ্রীভীষ্মদেব দৃঢ়ভাবেই

উল্লেখ করেছেন —

যে চ বেদবিদো বিপ্রা যে চাধ্যাত্মবিদো জনাঃ।
তে বদন্তি মহাত্মানং কৃষ্ণং ধর্মং সনাতনম্ ।।

অর্থাৎ যিনি সঠিকভাবে বেদ অধ্যয়ন করেছেন, যিনি প্রকৃত বিপ্র বা বেদজ্ঞ, যিনি পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে যথার্থই অবগত, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসরন করাই জীবের সনাতন ধর্ম বলে বর্ণনা করেন (মহাভারত)।

৭৩। 'হরি' শব্দের অর্থ কি?

উত্তর ঃ 'হরি' শব্দের অর্থ হচ্ছে —যিনি মায়াবদ্ধ জীবের সকল প্রকার অনর্থ হরণ বা অপনোদন করেন তিনিই 'হরি'।ভগবানের অসংখ্য নাম, যেমন— কৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহ, বিষ্ণু, বামন, মধুসূদন, নারায়ণ, কেশব, মাধব ইত্যাদি —তেমন 'হরি' ও ভগবানের অসংখ্য নামের একটি। ভগবানের প্রত্যেকটি নাম সর্বশক্তি-সম্পন্ন ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

৭৪। ভগবান কিভাবে সর্বব্যাপ্ত ?

উত্তর ঃ সূর্য যেমন অনন্ত কিরন বিকিরন করে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানও তেমনই তাঁর সর্বব্যাপ্ত রূপ বা পরমাত্মারূপে বিরাজমান। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পিপিলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবই তাঁকে আশ্রয় করে আছে। তাঁর সেই সর্বব্যাপী রূপের মধ্যে অসংখ্য মস্তক, পদ, হস্ত, চক্ষু এবং অসংখ্য জীবাত্মা রয়েছে। সবই পরমাত্মার মধ্যে এবং ওপরে বিরাজ করছে। তাই পরমাত্মা সর্বব্যাপ্ত। যদিও তিনি সর্বদাই তাঁর ধাম গোলক বৃন্দাবনে লীলাবিলাস করছেন তবুও তিনি 'অখিলাত্মভূত'— সর্বত্রই বিরাজমান।

৭৫। যথার্থ জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ জড়া প্রকৃতি, পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারলে মুক্তিলাভের যোগ্যতা অর্জন করা যায়। জন্মমৃত্যুর চক্র অতিক্রম করে চিজ্জগতে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। জ্ঞানের উদ্দেশ্য, জীব যে ঘটনাচক্রে এই জড়জগতের বন্ধনে পতিত হয়েছে। তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা ।

৭৬। শ্রীভগবান কিভাবে বদ্ধজীবদের পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেন ?

শ্রীভগবানের অনন্য ভক্তেরা এই জগতে আবির্ভূত হন ভগবানের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনেরই জন্য। শ্রীভগবান চান যে, জড় জগতে ভ্রাম্যমান বদ্ধ জীবেরা যেন উদ্ধার লাভ করে এবং তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যায়। তাই তিনি বেদ গ্রন্থাদির মতো অপ্রাকৃত শাস্ত্রসম্ভার সৃষ্টি করেন, সাধু সন্তদের প্রেরণ করেন, এবং তাঁর প্রতিনিধিকে গুরুরূপে নিয়োজিত করে মানুষকে সাহায্য করে থাকেন।

৭৭। ভগবদ্‌গীতার উপদেশ অনুসারে সার্থক ভক্ত কে ?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ চান —সকলেই যেন তাঁর শরণাগত হয়। আর ভগবদ্ভক্তি মানে সারাজগৎ জুড়ে, ভগবানের নির্দেশ প্রচার। ভগবান গীতায় স্পষ্টই বলেছেন, 'ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয় কৃত্তমঃ' (১৮/৬৯) সকলের মঙ্গলের জন্য গীতার বাণী যিনি প্রচার করেন, তিনিই ভগবানের সবচেয়ে প্রিয়জন। ভগবান গীতার মাধ্যমে যা বলেছেন, তার মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে মানুষ সম্যকভাবে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে মানব সমাজে সর্বোতভাবে সংস্কার সাধন সম্ভব হতে পারে। তাই সকলের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে যিনি এই কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শন প্রচার করেন; তিনি যথার্থই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিমার্গে অবস্থান করছেন।

৭৮। ভগবৎ সেবা মানেই 'গতিশীল কৃষ্ণ কর্ম'— ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ঃ নিষ্ক্রিয় অলস ধ্যানযোগ দ্বারা ভগবদ্ভজন হয় না। সবকিছু সুষ্ঠুভাবে ভগবৎসেবায় নিয়োগ করতে হবে। সাফল্য জনক ভাবে কৃষ্ণানুশীলনের জন্য প্রয়োজন দৃঢ়তা এবং ধৈর্যশীলতা। সদ্‌গুরুর নির্দেশে জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই ভগবৎসেবা করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যপ্ত, তাই ভগবৎ সেবায় সর্বব্যাপী হওয়া চাই। যা হবে 'গতিশীল কৃষ্ণকর্ম'। ভগবদ্ভজন অপ্রাকৃত কর্ম। বৈধিভক্তির নিয়মকানুন বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে ভক্তিসাধনায় অগ্রগতি

অবরুদ্ধ হবে। তাই শ্রীলরূপ গোস্বামী বলেছেন— । তত্তৎকর্ম প্রবর্তনাৎ'।

৭৯। ভক্তসঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের ছয়টি প্রধান লক্ষণ কি কি ?

ভক্তসঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের ছয়টি বিষয় হল—

১। ভক্তকে কিছু দান করা।
২। ভক্তের প্রতিদান গ্রহণ করা।
৩। ভক্তের মনের কথা অন্য ভক্তকে ব্যক্ত করা।
৪। অন্যভক্তের মনের কথা শোনা।
৫। ভক্তের দেওয়া ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করা।
৬। ভক্তকে ভগবৎ-প্রসাদ প্রদান করা।

৮০। পরাবিদ্যা কাকে বলে ? কখন একজন দীক্ষালাভের জন্য যোগ্য বিবেচিত হন ?

উত্তর ঃ দিব্যজ্ঞানকে পারমার্থিক ভাষায় তদবিজ্ঞান বা পরাবিদা বলে। জীবনের শ্রেয়স্কর এই বিদ্যা জড়াতীত তাই তা উত্তমম্‌। যিনি পরাবিদ্যালাভে অনুসন্ধিৎসু তাঁর সদ্‌গুরুর শরনাপন্ন হয়ে দীক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। পারমার্থিক জীবনে উন্নতির উপায় সম্বন্ধে ভাগবতে বলা হয়েছে 'তপসা ব্রহ্মচর্যেন শমেন চ দমেন চ' যিনি দীক্ষালাভ করতে চান, তাকে তপস্যা করতে হবে। মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। কেউ যদি এইসব সাধন করে দিব্যজ্ঞান লাভ করতে চায় সে তখন দীক্ষালাভের যোগ্য হয়।

৮১। ভগবদ্ভজন সম্বন্ধীয় সমস্ত উপদেশের সারাংশ কি?

উত্তর ঃ ভক্ত কৃষ্ণসেবা ভিন্ন অন্যসব অভিলাষ ত্যাগ করে কেবল শাস্ত্রানুগ বৈধীভক্তি অনুশীলন করবেন। ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ লীলাদিতে আসক্তি হবে। তখন বৈধীভক্তি না করে রাগানুগ ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করলেই হবে। ব্রজবাসীর পদাঙ্ক অনুসরন করে শান্তরসে (গোবৎস, হাতের লাঠি বা গলার মালারূপে), দাস্যরসে (চিত্রক, পত্রক বা রক্তকের পদাঙ্ক অনুসরণে), সখ্যরসে (শ্রীদাম, সুদামের মতো), বাৎসল্য-রসে (নন্দমহারাজ, যশোদাদির মতো) আর মাধুর্যরসে (রাধারাণী, তাঁর সখি ললিতাদি বা মঞ্জরী রূপ ও রতির মতো) ভজন করা উচিত। ভগবদ্ভজন সম্বন্ধীয় সমস্ত উপদেশের এই হচ্ছে সারাংশ।

৮২। আমাদের পাপময় জীবনকে পবিত্রীকরণের জন্য শাস্ত্রে কোন পদ্ধতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর ঃ সাধারণতঃ কেউ তপশ্চর্যা, সমতা, দানশীলতা ও পূত ব্রহ্মচর্যপূর্ণ জীবনযাপন করলে লোকে তাকে মহাপুণ্যবান বলে। কিন্তু শুধু কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের মাধ্যমে বিগত জীবনের সমস্ত পাপের ফল নিঃশেষিত ও বিনষ্ট হয়। যেমন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা দূরীভূত হয় তেমনি ভক্তি অনুশীলনের ফলে সহস্র সহস্র সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে কৃষ্ণসূর্য উদিত হয়।

৮৩। 'বৈদিকশাস্ত্র, কোরান বা বাইবেল যে কোন একটি পন্থায় ভগবানের সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধ-জ্ঞান শিক্ষা করা উচিৎ'— এই প্রসঙ্গে নীতিশাস্ত্রের উপদেশটি কি?

উত্তর ঃ নীতিশাস্ত্রের উপদেশ হচ্ছে যে, যে-কোনো পন্থা থেকে সঠিকটি গ্রহণীয়। কোনো বিষপূর্ণ পাত্রে সামান্য অমৃত থাকলেও চাণক্য পণ্ডিতের মতে বিষ পরিত্যাগ করে ঐ অমৃতটুকু সংগ্রহ করা কর্তব্য, ঠিক সেইরকম আবর্জনাপূর্ণ স্থানে সোনা পাওয়া গেলে। তা তখনই সংগ্রহ করা উচিত। বৈদিক শিক্ষাবিধি অনুযায়ী ব্রাহ্মণের ন্যায় বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তির সমাজের উপদেষ্টা হওয়া উচিত, সমাজের নিম্নস্তরে জাত ব্যক্তি শাস্ত্রবিদ্ বা তত্ত্বজ্ঞ হলে, তাকে শিক্ষকরূপে গ্রহণ করে তার কাছে উপদেশ গ্রহণ করা কর্তব্য। যিনি ঐকান্তিকভাবে ভগবানকে উপলব্ধি করতে চান, তার নিজেকে হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীস্টান বলে ভাবা উচিৎ নয়। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত পন্থার মত শরণাগতি ও ভগবদুপলব্ধির একটি কার্যকর ফলপ্রসূ প্রনালী থাকলে তা গ্রহণীয়।

৮৪। পুণ্যবান ব্যক্তির থেকে পর্যায়ক্রমিক ভাবে কারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ? সর্বাপেক্ষা প্রিয় কে ?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, সকল প্রকার সৎকর্ম নিরত পুণ্যবান কর্মীর তুলনায় চিদান্বেষী জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রীহরির প্রিয়। ঐ সকল জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং যারা তাদের জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তির স্তর লাভ করেছেন, তারা ভক্তি-সেবা

লাভ করতে পারেন। তিনি অন্যান্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ এবং যিনি প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন তিনি ঐ মুক্তিপ্রাপ্ত জ্ঞানীব্যাক্তিদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রজনারীগণ (গোপীগণ) ভক্তির অনন্যস্তরে অধিষ্ঠিতা, কারণ তাঁরা কৃষ্ণগতপ্রানা। ঐ গোপীদের মধ্যে আবার শ্রীমতি রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়।

৮৫। চারটি অনুমোদিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় কি কি ? তাদের আচার্য কে কে ?

উত্তর ঃ ব্রহ্মমধ্ব সম্প্রদায় — ব্রহ্মা থেকে পরম্পরা (মধ্বাচার্য)
শ্রী সম্প্রদায় — লক্ষ্মীদেবী থেকে পরম্পরা (রামানুজাচার্য)
রুদ্র সম্প্রদায় — রুদ্র থেকে পরম্পরা (বিষ্ণুস্বামী)
কুমার সম্প্রদায় — চতুঃস্বন থেকে পরম্পরা (নিম্বার্কাচার্য)

৮৬। ভক্ত পরিবারে চারটি কর্তব্যকর্ম কি ?

উত্তর ঃ

১) একাকী বা সম্মিলিত ভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করা
২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত দ্রব্যসমূহ, প্রসাদ গ্রহণ করা ও বিতরণ করা।
৩) ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা, পাঠ, আলোচনা ও প্রচার করা।
৪) বিগ্রহ অর্চনা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তের নিকট প্রার্থনা করা।

৮৭। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধির সামর্থ্য অনুসারে কতভাবে উপলব্ধি করা যায় ?

উত্তর ঃ পরমার্থবাদীরা ভগবানকে তিনভাবে উপলব্ধি করে থাকেন—
ব্রহ্ম — সূর্যকিরণের ন্যায়।
পরমাত্মা — সূর্যগোলকের সঙ্গে তুলনীয়।
ভগবান — শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যেমন সূর্যদেব

৮৮। জীবাত্মা প্রকৃত অর্থে কেন ত্যাগী হতে পারে না ?

উত্তর ঃ সম্পূর্ণ নিঃস্ব হওয়া মাত্র জীবাত্মা অস্তিমদশা প্রাপ্ত হয়। তাই জীবাত্মা প্রকৃত অর্থে ত্যাগী হতে পারে না। আরও মূল্যবান কিছু প্রাপ্তির জন্যই জীব ত্যাগ করে। ছাত্র বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে তার বালকোচিত চপলতা ত্যাগ করে। উচ্চতর চাকরির জন্যই কর্মচারী তার কর্ম ত্যাগ করে। সেইরকম অর্থহীনভাবে কৃষ্ণভক্ত ভবসংসার ত্যাগ করেন না, পক্ষান্তরে বাস্তব কিছু প্রাপ্তির জন্য তিনি তা করেন।

৮৯। 'জীবে দয়া' বলতে কি বোঝায় ?

উত্তর ঃ পরের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তা বিমোচনের যে চেষ্টা তার নাম দয়া। জীব কৃষ্ণকে ভুলে গেলেই তার সংসার দুঃখ। মায়াবশে বদ্ধজীব ভুক্তি, মুক্তি সুখের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা দেখে মুক্তজীব (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত) তাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করেন। নামতত্ত্ব, নামের মাহাত্ম্য, নাম সংকীর্তনের দ্বারা উদ্ধার বা ভক্তিপথের সন্ধান দেওয়াই পরমার্থ বিচারে জীবে দয়া।

৯০। পরমার্থের অর্থ কি? আবার অর্থই অনর্থের মূল বলতে কি বোঝায়?

উত্তর ঃ অর্থ শব্দে প্রয়োজনকে বোঝায়। পরমার্থ শব্দে শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন জীবনের শ্রেয়লাভকে বোঝায়। জড়জগতে যাকে আমরা ভোগের বস্তু বা অর্থ বলি, তাই অনর্থ ও সেই অনর্থই আমাদেরকে দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট করে অমঙ্গলকেই মঙ্গল বলে ভ্রান্তি উৎপন্ন করায়। এজন্য লৌকিক প্রয়োজন বাসনাযুক্ত জীবকে উত্তরোত্তর ঈশ্বর সেবা থেকে বঞ্চিত করে। ধর্ম, অর্থ, কাম- এগুলি জীবের ভোগ। যাতে নশ্বর দেহের কাম চরিতার্থ হয় সেই অর্থ নিত্য ভগবদুদ্দেশে লাগে না। তা উৎকণ্ঠারই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্য বলা হয় অর্থই অনর্থের মূল।

৯১। যে কোনো লোক ভক্তিপূর্বক ভগবানকে পত্র, পুষ্প, ফল, মূল ও জল দিলে, তিনি গ্রহণ করেন। অদীক্ষিত ব্যক্তি বা বহু দেবদেবীর উপাসক প্রভৃতি ব্যক্তি দিলে কি তিনি গ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ ভক্তি নিত্য ও পবিত্রা, তাতে কামনা স্পর্শ করে না। এমনকি খ্রীস্টান ধর্মে দশটি আদেশের মধ্যে, ঈশ্বরের নাম বৃথা বা অযথা গ্রহণ করবে না, নিয়মটিতে সকাম বাসনা নাই। সুতরাং ভক্তিপূর্বক অর্থাৎ অন্যাভিলাষ শূন্য হয়ে জ্ঞান কর্ম নিজ স্বার্থ পরিত্যাগ করে হরিসেবার উদ্দেশ্যে যে যা শ্রদ্ধাসহকারে প্রদান করেন, তা ভগবান গ্রহণ করেন। অদীক্ষিত ব্যক্তির ভক্তি নাই বলে বা দেবোপাসক ব্যক্তি নিষ্কপট ঐকান্তিক নয় বলে ভগবান তার কোনো বস্তু গ্রহণ করেন না।

৯২। জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়?

উত্তর ঃ ভক্তি বড়। ভক্তি হচ্ছে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের জনক। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির ফলে সেই ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য আপনা থেকেই উদিত হয়। অর্থাৎ তাকে আর স্বতন্ত্র জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়াস করতে হয় না।

ভক্তিবিহীন যে জ্ঞান তা শুষ্ক। সেইরূপ মনোধর্মের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ নিঃসৃত ব্রহ্মজ্যোতি বা নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতীতি হয় মাত্র, তার দ্বারা সর্বকারণের কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না বা লাভ করা যায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করেছেন যে, একমাত্র ভক্তির দ্বারা তাঁকে জানা যায়। বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা, দান বা পূজা দ্বারা ভগবান কৃষ্ণকে লাভ করা যায় না। একমাত্র শুদ্ধভক্তির দ্বারা ভগবান কৃষ্ণ সহজ লভ্য হন। যখন কেউ ভগবান কৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, তখন জ্ঞানীদের ব্রহ্মোপলব্ধি এবং যোগীদের পরমাত্মা উপলব্ধি করা বাকি থাকে না। তাই ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন সর্বপ্রকার যোগের মধ্যে ভক্তিযোগ সর্বশ্রেষ্ঠ।

৯৩। ভক্তি বলতে কি বোঝায়?

উত্তর ঃ ভগবৎ সেবার অপর নাম ভক্তি।

(ভজ্ ধাতু ক্তি = ভক্তি) নিষ্কামভাবে কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করাই ভক্তি।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু অনুসারে অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা, পরিত্যাগ করে অনুকূলভাবে জ্ঞান ও কর্মের আবরন মুক্ত হয়ে কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। আবার শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে উল্লেখ করা হয়েছে সমস্ত প্রকার উপাধি মুক্ত (নিজ সুখ পরিত্যাগ করে) হয়ে অনুকূল ভাবে এবং নির্মল হয়ে কায়মনোবাক্যে হৃষিকেশ শ্রীহরির যে সেবা তাই ভক্তি বলে কথিত।

৯৪। শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণসমূহ কি কি ?

শুদ্ধভক্তির ছয়টি লক্ষণ আছে—

১) শুভদা— (ক) সকলের সর্বতোভাবে মঙ্গল বিধান করে।
(খ) সকলকে আকর্ষণ করে।
(গ) সর্বগুণের বিকাশ সাধন করে।
(ঘ) সর্বোত্তম আনন্দ দান করে।

২) ক্লেশঘ্নী— সবরকম ক্লেশ তৎক্ষনাৎ নিবৃত্তি করে

৩) মোক্ষলঘুতাকৃত— মুক্তিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে

৪) সুদুর্লভা— নিজের প্রচেষ্টায় লাভ করা যায় না। কৃষ্ণ সহজে ভক্তি দেন না।

৫) সান্দ্রানন্দ -বিশেষাত্মা— অপরিমিত ঘনীভূত আনন্দ।

৬) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী— কৃষ্ণকেও আকর্ষণ করে অন্তরঙ্গা শক্তির অধীন কেবলমাত্র ভালোবাসা।

৯৫। ভক্তিমূলক সেবার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ৫টি অঙ্গ কি কি ?

উত্তর ঃ ভগবদ্ভক্তির পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ—

(১) শ্রীবিগ্রহ সেবা।
(২) শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ (ভক্তসঙ্গে)
(৩) ভক্তসঙ্গ।
(৪) ভগবানের পবিত্র নাম (হরেকৃষ্ণ) কীর্তন ও
(৫) মথুরা (ধাম) বাস।

৯৬। পাঁচ প্রকারের ক্লেশ ভক্তির দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়- সেগুলি কি কি ?

উত্তর ঃ ১) অবিদ্যা— অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি অশুচিতে শুচিজ্ঞান, দুঃখকে সুখ অনুভব এবং অনাত্মাতে আত্মজ্ঞান করাকে অবিদ্যা বলা হয়।

২) অস্মিতা—মিথ্যা অহঙ্কার আমি ও আমার এরূপ দেহাত্মবুদ্ধি এবং প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে কেবল সত্য বলে মনে করা।

৩) রাগ— আসক্তি, জড় সুখ লাভ ও দুঃখের নিবৃত্তির উপায়কে রাগ বলে। অথবা ইপ্সিত কামনাকে রাগ বলে।

৪) দ্বেষ— ঘৃণা, দুঃখ বা দুঃখের কারণের প্রতি বিরক্তিকে দ্বেষ বলে।

৫) অভিনিবেশ— দৈহিক সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি। মৃত্যু- এই সমস্ত দৈহিক সুখ থেকে বঞ্চিত করে বলে মরণের প্রতি ভয়কে অভিনিবেশ বলে।

৯৭। কৃষ্ণভাবনা সর্ব মঙ্গলময়) বলতে কি বোঝায় ?

উত্তর ঃ যথার্থ মঙ্গল সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন করে। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে মানুষ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবদ্ভক্তি সাধনে তৎপর হয়েছেন। তিনি সমস্ত জগতের সর্বোত্তম সেবা করতে করতে সমস্ত জীবের পরম কল্যাণ, সাধন করেন। তিনি কেবল মানব সমাজেরই নয়, গাছপালা, পশুপাখীদেরও কল্যাণ সাধন করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ঝাড়িখণ্ডের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তার একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছেন। সেই বনের বাঘ, হাতি, হরিণাদি সমস্ত বন্যজন্তুরা তাঁর সঙ্গে 'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে করতে নৃত্য করেছিল। জড়বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষিত না হলেও কৃষ্ণভাবনাময় ভাবিত যুবক পরস্ত্রী গমন, দ্যূতক্রীড়া, মাংসাহার ও মদ্যপান এই সমস্ত পাপকর্ম থেকে অনায়াসে নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু যারা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত নয়, তারা শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই মদ্যপায়ী, মাংসাহারী, লম্পট ও জুয়াড়ী হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়ার ফলে মানুষের সর্বোচ্চ চরিত্র বিকশিত হয়।

৯৮। ভক্তি কিভাবে ভগবানের থেকেও মহত্তর ?

উত্তর ঃ ভক্তি শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত আকর্ষণ করে। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আকর্ষণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভাগবতে এই সত্যকে স্বীকার করে বলেছেন— "হে উদ্ধব ভক্তের প্রবল ভক্তি যেভাবে আমাকে আকর্ষণ করে। যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, বেদ অধ্যয়ন, তপ, ত্যাগ, দান, আদি পুণ্য কর্ম তা করতে পারে না। (শ্রী ভা. ১১/১৪/২০) শ্রীকৃষ্ণ যদিও পরমেশ্বর ভগবান, সমগ্র বিশ্বচরাচরের অধীশ্বর, তবুও তিনি পাণ্ডবদের ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে, তাঁদের সখ্য ও প্রীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাদের সঙ্গে বাস করতেন। ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্যের এটিই প্রমাণ। ভগবান মহান, কিন্তু ভক্তি ভগবানের থেকে ও মহত্তর, কেননা তা তাঁকেও আকর্ষণ করে।

৯৯। "বস্তুত কৃষ্ণচেতনা ছাড়া অন্য কোনো চেতনা নেই" বিশ্লেষণ করুন। কখন আমরা ভগবদ্ধামে বাস করতে পারবো ?

উত্তর ঃ বস্তুত কৃষ্ণচেতনা ছাড়া অন্য কোনো চেতনা নেই। কৃষ্ণভাবনাহীন মানুষদের মধ্যে চেতনের বাস্তব লক্ষণ অনুপস্থিত। চেতনাই হচ্ছে চিন্ময়।

এইভাবে, এমন কি এই জড় জগতে থাকাকালীন, শুধু আমাদের কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধি করলেই আমরা ভগবদ্ধামে বাস করতে পারবো। আমরা কৃষ্ণমন্দিরে বাস করলে, আমাদের ভগবদ্ধামে বাস হবে। কারণ কৃষ্ণমন্দিরে কৃষ্ণভজনা ছাড়া অন্য কাজ নেই। কতরকম কৃষ্ণসেবা রয়েছে। যারা কঠোরভাবে নিয়মনিষ্ঠ হয়ে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করেন তারা জড়জগতে বাস করেন না, তারা বৈকুণ্ঠজগতে আছেন। এটি হচ্ছে চেতনার প্রশ্ন। ছারপোকা ও সদ্‌গুরু একই আসনে উপবেশন করলেও সদগুরু হচ্ছেন কৃষ্ণভাবনাময় তার ছারপোকার ভাবনা পৃথক, তাই তারা বিভিন্ন।

উভয়েই একইস্থানে উপবেশন করলেও ছারপোকা ছারপোকাই থাকে এবং গুরুদেব গুরুদেবই থাকেন। আমাদের কৃষ্ণভক্তি বলবতী হলে, আমরা আর জড়জগতে নই। ভগবদ্ধামে।

১০০। বিভিন্ন যুগে মানুষের আয়ু, যুগধর্ম ও সাধন প্রনালী সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

উত্তর ঃ সত্যযুগে মানুষের জীবনকাল ১ লক্ষ বছর দীর্ঘ হয়, ত্রেতাযুগে দশগুণ কমে ১০ হাজার বছর, তার দশগুন কমে দ্বাপর যুগে মানুষের আয়ু ১ হাজার বছর। কলিযুগে মানুষের গড় আয়ু ১০০ বছর।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।।

সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞের মাধ্যমে যজন করে এবং দ্বাপরযুগে অর্চন-আদি করে যে ফল, কলিকালে কেবলমাত্র 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনে সেই সকল ফল লাভ হয়।'' এই কলিযুগে ধ্যান, যজ্ঞ বা অর্চনা নয়, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

কীর্তন করার ফলে পূর্ণ আত্মোপলব্ধি অর্জন করা যায়।

মনসংযোগের কৌশল



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উত্তরোত্তর উন্নতি সত্বেও মানবসভ্যতা কেন সমস্যায় জর্জরিত ?

একবিংশ শতাব্দির চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি আমাদের আশ্চর্যান্বিত করেছে, কয়েকশো বছর পূর্বে যা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। কত এয়ার কন্ডিশন, গাড়ী, ফাইভ্ ষ্টার হোটেল, উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা যা পৃথিবীকে অনেক ছোটো করে দিয়েছে। এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য - হয় সমস্ত বিশ্বকে দুর্দশা মুক্ত করা বা, দুর্দশা কমিয়ে আনা এবং তার ফলে সাধারন মানুষ আরো সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারবে। সুতরাং আমাদের উচিত সবথেকে উন্নত দেশগুলিতে এই প্রযুক্তি কি করছে দেখা। তারফলে আমরা আশা করতেই পারি ভালবাসা, শান্তি ও সমৃদ্ধি নাগরিকদের মধ্যে থাকবে। যদিও বর্তমানে তার বিপরীত বৈশিষ্ট্যই দেখা যাচ্ছে। বিশ্বের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রনকারী দেশগুলি যেমন আমেরিকা, জাপান যদিও ভারতের থেকে শতগুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত, তবুও আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যাচ্ছে সেখানেই ধনী ও যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবনতা সবথেকে বেশী। লোকেরা কোনোও না কোনো ভাবে ঐ দেশগুলিতে এই অবস্থা প্রশমনের চেষ্টা করছে। সবসময়ই তারা উৎকন্ঠিত, হতাশাগ্রস্থ এবং বিভ্রান্ত, দর্শনগতভাবে নয়; এটাই বাস্তব ঘটনা।

আজকাল আমেরিকায়, প্রথম বিবাহের ৩ বছরের মধ্যে বিচ্ছেদের (ডাইভোর্স) হার ৭৫%। অধিক থেকে অধিকতর লোককে (বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর লোক) রাত্রিতে ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে হয় আর তারা নিয়মিত মনস্তত্ত্ববিদদের নিকট ছোটে। লোকেরা এত বেশী আতঙ্কিত, যে অতিথিদের বিভিন্নভাবে আড়ালে রাখতে চায় এবং সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। এই প্রকার অপসংস্কৃতি বর্তমানে ভারতের শহরগুলিতেও দেখা যাচ্ছে। লোকগুলো যেন রোবোটের মত অনুভূতিহীন, যন্ত্রের মতো চালিত হচ্ছে। আবেগ বলে কোনোকিছু নেই। যদিও বা আছে তাও মিথ্যা ভাবপ্রবণতা।

যদি কেউ বাড়ীর বাইরে গিয়ে, নেশা, নারীসঙ্গ, জোচ্চুরি এড়িয়ে সফলতার সঙ্গে জীবিত অবস্থায় সন্ধ্যার পর পুনরায় বাড়ী ফিরে আসে। তাহলে বুঝতে হবে সে বিশেষ সৌভাগ্যবান।



আধুনিক সমাজে কিসের অভাব ?

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই আধুনিক সমাজের বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিতেন। যদি আমরা কতকগুলো কুকুরকে নিয়ে একটা রুমে তালা বন্ধ করে রাখি, তাহলে কি আশা করা যেতে পারে তারা একে

অপরকে দেখে হাসবে? তারা কি পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলবে? একজন বড়জোর আশা করতে পারে যে ঘটনাটা হবে এরকম— তারা চিৎকার করবে, কামড়াকামড়ি করবে এবং একে অপরকে মেরে ফেলবে। ঠিক অনুরূপ ঘটনাই আজকালকার সমাজে দেখা যায়। যদি জ্ঞানই শক্তি হয় তাহলে আমাদের সেই জ্ঞানের কি মূল্য আছে যা বর্তমান পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ। বর্তমান দিনে সারা বিশ্ব যে সমস্যার সম্মুখীন, তাতে সরকার, রাজনীতিবীদ, পুলিস, বিচার ব্যাবস্থা প্রভৃতির প্রতি দোষারোপ করে লাভ নেই। আমরা ভেতর থেকেই উদ্বিগ্ন, তাই অন্যকেও উদ্বেগ দিতে চাই। আমাদের মনের এই গতিপ্রকৃতির মূল্যায়ন করতে হবে এবং তখনই বোঝা সম্ভব হবে মনসংযমের কৌশল।



আপনি কি একটা শুধুমাত্র রক্তমাংসের থলি যার মূল্য ২১০ টাকা ?

সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে পরিচয় নিয়ে। 'আমি' কে ? আমি কি এই দেহ, মন, বুদ্ধি অথবা মাথা, বা নাক ? যদি কেউ নিজের প্রকৃত পরিচয় খুঁজে বার করতে পারে, তাহলেই কেবল সে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভের লক্ষ্যে কাজ করতে পারে। আমরা এই দেহ নই, আমরা শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা। আত্মার অস্তিত্ব কোনো তথাকথিত ধর্ম অনুসরণকারীদের অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়, যা কিছুলোক ভুলভাবে

চিন্তা করে থাকে। এটা উপলব্ধি, বিজ্ঞান ও যুক্তি সম্মত ভাবে প্রমান করা যায়।

একবার একজন বিজ্ঞানী একটি দেহ নিয়ে সেই দেহটির সমস্ত রাসায়নিক পদার্থকে পৃথক করে তার বাজার মূল্য যাচাই করে রিপোর্ট দিলেন যে ঐ দেহটির দাম দাঁড়াচ্ছে ২১০ টাকা। তা আপনি কি মনে করেন যে আপনার মূল্য ২১০ টাকা ? কেউ যদি তর্ক করে দেহটিই সব, দেহের মধ্যে উন্নততর আত্মা বলে কিছু নেই, সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখুক যে তার পিতামাতা তাকে ঐ ২১০ টাকায় বিক্রি করবে কিনা ?

যদি আপনার বন্ধু সাইকেল নিয়ে যেতে যেতে পড়ে যায়, আপনি কি করবেন ? নিশ্চয়ই আপনি . ২০০০ টাকা মূল্যের সাইকেলটি রাস্তায় ফেলে বন্ধুর ২১০ টাকা মূল্যের শরীরটি নিয়ে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে যাবেন। এমনকি যদি আপনার বন্ধু একটি মূল্যবান মার্সিটিজ বেঞ্জে চড়ে যেতে গিয়ে অন্য একটি গাড়ীর সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা মারে, তাহলেও আপনি ঐ ২১০ টাকা মূল্যের দেহটির জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে হাসপাতালে যাবেন আর রাস্তায় পড়ে থাকা ২৫ লাখ টাকা দামের গাড়ীটির কথা কোনো চিন্তাই হবে না। সুতরাং একজন সৎ ব্যাক্তির পক্ষে এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয় যে, জীবন্ত দেহের মধ্য এমন একটি মূল্যবান বিশেষ সত্তা আছে যার মূল্য এত বেশী এমন কি যদি তার সত্তা অর্থাৎ নিত্য আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান নাও থাকে। আত্মা হচ্ছে প্রকৃত নিত্য ব্যক্তিত্ব

যা এই অনিত্য দেহের মধ্যে বাস করে। যদিও সারা বিশ্ব তার সমস্ত অগ্রগতি নিয়ে এই অপ্রয়োজনীয় ২১০ টাকা মূল্যের দেহটির রক্ষণাবেক্ষণেই ব্যস্ত যা এক ব্যাগ রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়।

দেহকে একটি গাড়ীর সঙ্গে তুলনা করা হয়, আত্মাকে তুলনা করা হয় চালকের সঙ্গে। আত্মার (জীবনী সত্তা) উপস্থিতির জন্যই দেহকে জীবন্ত বলে মনে হয়। আত্মা যখন দেহ ত্যাগ করে, তখন দেহটি মৃত হয়ে যায়, গাড়ীর চারটি চাকা রয়েছে। আপনার দেহটির দুটি হাত ও দুটি পা রয়েছে। গাড়ীটি এক জায়গা হতে অন্যত্র চলাফেরা করে। আপনিও সেটাই করেন। কিন্তু গাড়ীটি থেকে চালক নেমে যাওয়ার পর ঐ গাড়ীটি ১০০ বছরেও এক ইঞ্চি চলতে পারে না, ঠিক তেমনি, যখন একজন মানুষ মারা যায়, শরীরটি তখন পুরোপুরিই ঐ চালকবিহীন গাড়ীর মতোই নিশ্চল, অনড়। সুতরাং আমরা যে দেহটিকে দেখি তা সবসময়ই মৃত। আত্মার উপস্থিতির জন্যই দেহকে জীবন্ত বলে মনে হয়, আত্মা যখন দেহ ত্যাগ করে। তখন দেহটি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

শরীরকে একটি খাঁচার সঙ্গেও তুলনা করা হয়, আর খাঁচার টিয়া পাখীকে তুলনা করা হয় শরীরস্থ আত্মার সঙ্গে। ধরুন কেউ খাঁচায় এইভাবে একটি পাখী পুষে কেবল খাঁচাটিকে সুন্দর ভাবে যত্ন করছে, ভালোভাবে ঘষে মেজে পালিশ করে ঝকঝকে করা ইত্যাদি। কিন্তু এসব করতে গিয়ে সে পাখীটির কথা বেমালুম ভুলে যায়।

পাখীটিকে দেয়না খাদ্য জল। ঠিক তেমনি, বর্তমান যুগে আধুনিক সভ্যতায় প্রত্যেকে দেহের জন্য সমস্ত রকম আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসিতা করার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত, কিন্তু আত্মার প্রয়োজনের দিকে কেউ দৃষ্টিপাত করছে না। সেজন্য প্রত্যেকেই পারমার্থিক ভাবে 'অনশনে' ভুগছে। প্রত্যেকেই অন্তরে বিষন্ন, নিরানন্দ এবং প্রত্যেকেই অজ্ঞান-তমসায় আবৃত হয়ে দুর্দশা ভোগ করছে।



দুঃখের কারণ এবং সুখী হওয়ার সূত্র

বৈদিক শাস্ত্র সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে আত্মার প্রকৃত বাসস্থান নিত্যধাম চিন্ময় জগতে। উপনিষদ থেকে জানা যায় —

নিত্যো নিত্যানাম, চেতনশ্চেতনানাম।
একো বহুনাম্ যো বিদধাতি কামান।।

সকল জীব সত্তার মধ্যে একজন পরম চেতন ব্যক্তি রয়েছেন, পরমপুরুষোত্তম ভগবান। ভগবান হচ্ছেন প্রভু আর জীব তাঁর অংশ। নিত্য সেবক। প্রত্যেক জীবাত্মাকে ক্ষুদ্র স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সে তার পছন্দ অনুযায়ী ভগবানকে ভালবাসতে ও সেবা করতে পারে অথবা ভগবান থেকে স্বতন্ত্রভাবে তথাকথিত ভাবে জড় জগৎকে ভোগ করার জন্য সংগ্রাম করতে পারে। সাধারণত এই জগতে জীবাত্মা দ্বিতীয়টি পছন্দ করে।

দেহ - ইন্দ্রিয়সমূহ - মন - বুদ্ধি

যান্ত্রিক পরিকাঠামো (Mechanism)

আত্মা সম্পর্কিত আরো আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে। যখন কেউ সঠিকভাবে জানতে পারে - দেহ - ইন্দ্রিয় - মন - বুদ্ধির যান্ত্রিক কাঠামো। কিভাবে এটা কাজ করে, তখন সে যথার্থ ভাবে মনকে সংযত করার কৌশল শিক্ষা করতে পারে।

আত্মা যখন এই জড়জগতে আসে তখন তাকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপযোগী একটি স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণ রূপ দেহ প্রদান করা হয়। মিথ্যা অহঙ্কারই হচ্ছে আত্মার জড়দেহে বন্ধনগ্রস্থ অবস্থা। প্রত্যেকেই এই দেহগত চেতনাই প্রকাশ করে। প্রত্যেকেরই 'আমি' 'আমার' এই ধারনা এবং 'আমি সুন্দর', 'আমি কালো', 'আমি লম্বা', 'আমি বেঁটে', 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি ভারতীয়' এই মিথ্যা অহঙ্কার। প্রকৃত বা সত্য অহঙ্কার হচ্ছে এটা উপলব্ধি করা যে সে ভগবানের নিত্য দাস। বুদ্ধি হচ্ছে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিচারক, (decision - maker) । বুদ্ধির দ্বারা ভালো - মন্দ বিচার করে মনকে উপযুক্ত নির্দেশ প্রদান করা হয় — কি করা হবে এবং কি করা চলবে না।

মন হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের কেন্দ্র এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ভোগের ধারনাসমূহ সেখানে জমা থাকে। মন হচ্ছে চিন্তা, অপূর্ণ ইচ্ছা এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার সংগ্রহশালা। মনের কাজ চিন্তা, অনুভূতি

এবং ইচ্ছা। মন হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ (চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং ত্বক) - এর সাধারণ কেন্দ্রস্থল। ইন্দ্রিয়সমূহ বহির্জগতের কার্যকলাপে সরাসরি যুক্ত। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি (চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক) তথ্য সংগ্রহ করে আর দেহটি তখন কর্মেন্দ্রিয় গুলির (বাক্, (মুখ), পা, হাত, পায়ু এবং উপস্থ) সাহায্যে কাজ করে। দেহের এই কার্যকলাপ সবসময়ই পাঁচটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত রূপ, গন্ধ, শব্দ, রস এবং স্পর্শ। সবকিছুই যা আমরা এই জগতে গ্রহন করি তা আমাদের এই পাঁচপ্রকার ইন্দ্রিয়ের বিষয় মধ্যে যে কোনো একটিতে আবদ্ধ করে।

এখন আমরা একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আলোচনা করব কিভাবে দেহ-মন-ইন্দ্রিয় সমূহ কাজ করে —

যখন আপনি রাস্তায় হাঁটছেন, আপনি দেখলেন একটি মিষ্টির দোকানে সুন্দর টাটকা গোলাপজাম রয়েছে। প্রথমত: আপনার চোখ (একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়) গোলাপজামের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এই তথ্য সে মনকে পাঠিয়ে দেবে। মন তখন দুটি বিষয় চিন্তা করবে ' পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুসারে গোলাপজামের সুমিষ্ট স্বাদ আর ওটাকে কিভাবে এখন গ্রহন করা যায়। মন তখন বুদ্ধির সঙ্গে পরামর্শ করে এবং বুদ্ধি হাত ও পা'কে (কর্মেন্দ্রিয়) দোকানে গিয়ে গোলাপজাম কিনতে নির্দেশ দেয়। এইভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির পারস্পরিক সহযোগিতায় দেহের কার্যকলাপের সমন্বয় সাধিত হয়।

দেহ রথ

উপনিষদের পাতায় একটি উপমা দেখা যায় যা আমাদের স্থুলদেহ, মন, বুদ্ধি এবং আত্মা সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে দেহটি একটি রথের ন্যায়। আত্মা রথের আরোহী। বুদ্ধি হচ্ছে সারথী এবং মন হচ্ছে লাগাম। যদি ইন্দ্রিয় সমূহ (পাঁচটি ঘোড়া) অসংযত ও পাশবিক হয়। তাহলে দেহ (রথ) কোথায় যাবে তার ঠিক নেই। যদি বুদ্ধি (সারথী) খুব শক্তিশালী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তাহলে সে মনকে (লাগাম) নিয়ন্ত্রন করতে পারে এবং ফলস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলিকে (ঘোড়া) সংযত ও শৃঙ্খলাপরায়ন করা যায়। তাই এই দেহ-আত্মা'র এই ব্যবস্থাপনার যথার্থ উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে যদি ইন্দ্রিয় সমূহ সংযত হয়।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে যদিও মন প্রধান ভূমিকা নেয়, তবুও বুদ্ধি তারও উপরে যা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বুদ্ধিরও উর্দ্ধে হচ্ছে আত্মা। ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে— 'স্থূল জড় পদার্থের থেকে চক্ষু, কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়ের থেকে মন আরও শক্তিশালি, মনের থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধি থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আত্মা,' (ভঃ গীঃ ৩/৪২)

দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা (নাগরদোলায় ঘোরা)

আত্মার স্বরূপ হচ্ছে সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। আত্মা নিত্য, শাশ্বত। অপরপক্ষে দেহ অস্থায়ী, এবং অজ্ঞানময় দুর্দশাপূর্ণ। দেহ ও আত্মা

এই দুইয়ের বিপরীতধর্মী অবস্থায়, জীব যার নিত্য আনন্দময় পরিবেশে সুখী হওয়ার কথা, সে কখনই অনিত্য দেহে সুখ লাভ করতে পারে না। জীবাত্মাকে পুন: পুন: জন্ম, বার্ধক্য, রোগ এবং মৃত্যুর মধ্যদিয়ে এক দেহ থেকে অন্য দেহে ঘুরে বেড়াতে হয়।
তাই শঙ্করাচার্য বলেছেন —

পুণরপি জনমং পুণরপি মরনং
পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্।
ইহ সংসারে বহু দুস্তরে
কৃপয়া পরে পাহি মুরারে।

'হে মুরারী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আমি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়ে বার বার মাতৃগর্ভে জন্ম যন্ত্রনা ও মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছি। আপনি অনুগ্রহ করে আমার প্রতি কৃপা বর্ষন করুন যাতে এই দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে নিস্তার লাভ করতে পারি।'

আত্মা কখনো কখনো কুকুরের দেহ পেতে চায়, কখনো মানুষের দেহ পায়, তার পূর্বকৃত কর্ম ও বাসনা অনুসারে। এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র একটা নাগরদোলার মতো। কখনো সবথেকে উঁচুতে আবার কখনো একেবারে নিচে। অনুরূপভাবে আত্মা একদেহ থেকে অন্য দেহে ঘুরতে থাকে যতক্ষণ না সে পুর্নরূপে স্তব্ধ হয়ে ভগবানের শরণাগত ভক্ত হয়।

মনের প্রকৃতি

মন (যা সুক্ষ শরীরের অংশ) জীবকে জড় জগতে বন্ধ রাখতে প্রধান ভূমিকা নেয়। সুতরাং মনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে মন কাজ করে, তার আচরণ এবং নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি জেনে তার উপযোগ করা।

চঞ্চল বানর (যে সবসময় লাফালাফি করে)

কখনো কখনো মনকে একটি বানরের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যে সব সময় এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। মন কখনো এক বিষয়ের মধ্যে স্থির থাকে না। কোন এক সময় সে একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করে পরক্ষনেই অন্য চিন্তা করে। মনকে কখনো কখনো শিশুর সঙ্গে তুলনা করা হয় যে সবসময় চঞ্চল ও সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রায় সকলেই সবসময় মনের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করতে ব্যাস্ত। কিন্তু মনকে কখনেই তৃপ্ত করা যায় না, কেননা মনের অসংখ্য চাহিদার কতগুলো পূরণ করা সম্ভব ? মন একটি অসতী নারী বা বেশ্যার মতো যে বিভিন্ন রংয়ের পোশাক পরিধান করে, বিভিন্ন ধরনের লোককে আকৃষ্ট করার জন্য। অনুরূপভাবে অনিয়ন্ত্রিত মন একজন মানুষকে সহজেই অধ:পতিত করে।

এমনকি মহান ব্যাক্তিত্ব অর্জুনও অকপটে স্বীকার করেছেন যে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন। ভগবদ্গীতায় (ভঃ গীঃ ৬/৩৪)

বলা হয়েছে —

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম।

"হে কৃষ্ণ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয় আদির বিক্ষেপ উৎপাদক, দুর্দমনীয় এবং অত্যন্ত বলবান, তাই তাকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভূত করার থেকেও অধিকতর কঠিন বলে আমি মনে করি।"

অর্জুন এরকম একজন মহান যোদ্ধা, তবুও তিনি মনে করছেন যে অস্ত্রের দ্বারা এমনকি বায়ুকে নিয়ন্ত্রন করা যেতে পারে কিন্তু মনকে দমন করার কোনো আশা নেই।

অনিয়ন্ত্রিত মন ঃ আপনার কি করতে পারে ?

হতাশ বিপদাপন্ন পাগল ভয়ঙ্কর রোগ দৃঢ়তার অভাব		সন্দেহ গ্রস্ত বিশ্বস্ততার অভাব দুশ্চিন্তা নিজেকে ধ্বংস তথা পরিবার ও সমাজের অধঃপতন

ইন্দ্রিয় সমূহকে বিচলিত করে, অস্থির মতি এবং কামুক স্বভাব

অনিয়ন্ত্রিত মন ঃ আপনার কি করতে পারে ?

একজন ব্যক্তি যার মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ অনিয়ন্ত্রিত অচিরেই তাকে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়তে হয়। একদিকে জিহ্বা সুস্বাদু খাবারের জন্য তাঁকে টানতে থাকে, তারপর তৃষ্ণা প্রয়োজনীয় পানীয়ের ব্যবস্থা করতে বলে, একই সাথে উপস্থ (ইন্দ্রিয়) যৌন-তৃপ্তির জন্য লালায়িত হয় এবং সে কোমল অনুভূতি সুখস্পর্শ পেতে চায়। উদর অতৃপ্ত থাকে যতক্ষণ না তার পূর্তি হয়, কান দাবী করে মধুর শব্দ শোনার, নাসিকাও সুগন্ধের জন্য উৎকণ্ঠিত আর চোখ জগতের সৌন্দর্যকে ভোগ কররে চায়। এইভাবে ইন্দ্রিয়সমূহ জীবকে বিভিন্ন দিকে টানতে থাকে।

অনিয়ন্ত্রিত মনের জন্যই এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি পথভ্রষ্ট হয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে। মূর্খ মানুষ জানে না কিভাবে এর সমাধান করতে হয়। যখন জীবনে কোনো বিপদ আসে, সে তখন হতাশায় ধূমপান, মদ্যপান অথবা আত্মহত্যা করে বসে ঐ যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। কিন্তু পরিণতিস্বরূপ পূর্বাপেক্ষা আরো যন্ত্রনাকে সে আহ্বান করে। আধুনিককালে আমরা ব্যবহারিকভাবে দেখতে পাই - মানুষের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা। বিশ্বস্ততার অভাব, দৃঢ়তার অভাব ইত্যাদি — সবই অনিয়ন্ত্রিত মনের জন্য।

সমস্ত বিশ্বকে প্রাপ্ত হয়েও যদি কেউ নিজের আত্মাকেই হারিয়ে ফেলে তাহলে কি লাভ ? — নিশ্চিতরূপে এটা অনুভূতির প্রশ্ন।

অনেক অর্থ প্রতিপত্তি, সৌন্দর্য বা শক্তি থাকা সত্ত্বেও সুখ নেই। সুখলাভের প্রকৃত রহস্য হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত মন, যা ক্রমে ক্রমে ভগবদ্ভাবনাময় জীবনের পথ প্রাপ্ত করায়।



মন কি আমাদের বন্ধু হতে পারে ?

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।
(ভ: গী: ৬/৬)

যিনি তার মনকে জয় করেছেন, তাঁর মন তাঁর পরম বন্ধু। কিন্তু যিনি তা করতে অক্ষম, মনই তাঁর পরম শত্রু।

এইভাবে মনের প্রবৃত্তি সুখ বা দু:খের কারন হয়। মনকে একটা ধারালো ছুরির সঙ্গেও তুলনা করা যেতে পারে। ঐ ছুরির দ্বারা কাউকে হত্যা করা যায় আবার সুদক্ষ চিকিৎসক ঐ একই ছুরির সাহায্যে কারো প্রাণ রক্ষা করেন। সেক্ষেত্রে ছুরিটির কোনো দোষ নেই। কারো মন যখন নিয়ন্ত্রিত থাকে তখন তার সাহায্যে জীবনের সর্বোত্তম পূর্ণতা লাভ করা যায়। তিনি স্বেচ্ছায় পরমেশ্বর ভগবানের (যিনি হৃদয়ে পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন) নির্দেশ অনুসারে চলেন।

ঐ ব্যক্তি জড়-অস্তিত্বের দ্বন্দ্বভাবের (যেমন সুখ, দু:খ বা শীত, গ্রীষ্ম ইত্যাদি) দ্বারা বিচলিত হন না। সর্বদা পরমেশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অনিয়ন্ত্রিত মনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। ঐ প্রকার মন সবসময়ই বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পরিকল্পনা করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন — 'ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে মানুষের তাতে আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে কাম উৎপন্ন হয় এবং কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম। স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে সর্বনাশ হয়। অর্থাৎ মানুষ পুনরায় জড়জগতের অন্ধকূপে অধঃপতিত হয়।''

এইভাবে অসংযত মনই আমাদের এই জড় জগতে থাকাকালীন যাবতীয় দুর্দশার কারন। যদি মন সংযত হয় তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি আর আমাদের বিপদে ফেলতে পারে না। বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরিচালিত করতে হবে, এখন স্বাভাবিকভাবেই ইন্দ্রিয়গুলি তাকে অনুসরন করবে। রথের সারথীকে অবশ্যই দক্ষতার সঙ্গে চিৎকার করে, শক্তি প্রয়োগ করে লাগামকে ধরে রাখতে হবে, যাতে ঘোড়াগুলি নিয়ন্ত্রনে থাকে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ নিয়মিত ভাবে শ্রবন করে বুদ্ধিকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন —

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
(ভ: গী: ৪/৩৪)

সদগুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্রচিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।

এই পদ্ধতি অনুসরন করলে বুদ্ধি আরো শক্তিশালী হবে এবং অসংযত মন অচিরেই শান্ত হবে। পারমার্থিক শাস্ত্র নির্দেশ সমূহ বুদ্ধির খাদ্য স্বরূপ। ঐ সকল বুদ্ধি বৃত্তিকে বিকশিত করে এবং মনকে পবিত্র করে তোলে। যখন বুদ্ধি(চালক) দক্ষ, শক্তিশালী হয়, তখন সে মনকে (লাগাম) দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ফলে আত্মা (আরোহী) শান্তিপূর্ণ ভাবে ভ্রমন করতের পারবে। কিন্তু যতক্ষন বুদ্ধি মনের থেকে দুর্বল থাকে, ততক্ষন আমাদের জীবনে সুখ বা শান্তি কোনোটাই সম্ভব নয়।



মন্ত্র-ধ্যানের মাধ্যমে মন-সংযম—কচ্ছপের কৌশল

সদ্‌গুনাবলীর বিকাশ এবং জীবনে প্রকৃতই সুখী হতে হলে মনকে অবশ্যই সংযত করতে হবে। এবিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন —

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।

কূর্ম (কচ্ছপ) যেমন তার অঙ্গ সমূহ তার কঠিন বহিরাবরনের মধ্যে সঙ্কুচিত করে, তেমনই যে ব্যক্তি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন, তাঁর চেতনা চিন্ময় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত।

ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষধর সর্পের সঙ্গেও তুলনা করা হয়। তারা কোনো নিয়ন্ত্রন ছাড়াই থাকতে চায়। কিন্তু আমাদের দক্ষ সাপুড়ের মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া দরকার যাতে ঐ সর্পগুলি (ইন্দ্রিয় সমূহ) ছোবল মারতে না পারে। শাস্ত্রে অনেক উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে কতগুলি বিধি (করণীয়) এবং কতকগুলি নিষেধ (অকরনীয়)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত কচ্ছপের দৃষ্টান্তটি এক্ষেত্রে খুবই উপযুক্ত। কচ্ছপ যে কোনো সময় নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে খোলসের মধ্যে গুটিয়ে নিতে পারে আবার পুনরায় প্রয়োজনে বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রকাশ করে।

জীবনে বিধিনিয়ম পালনই-প্রকৃত স্বাধীনতা

আমাদের অবশ্যই এই প্রকার কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা উচিত যা মনকে এবং চেতনাকে কলুষিত করে তোলে। প্রাথমিক ভাবে সেগুলি হল - আমিষাহার, জুয়াখেলা, মাদকগ্রহণ বা নেশা ও

অবৈধ যৌনক্রিয়া। এই কার্যকলাপগুলি অবশ্যই কঠোরভাবে বর্জন করা উচিত। বেশির ভাগ লোকেই বলে, "কেন আমি যা চাই তা থেকে আমাকে বিরত হতে বলছেন ? আমি স্বাধীন থাকতে চাই যেভাবে আমি পছন্দ করি।" প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সীমাবদ্ধ কার্যকলাপের কথা বলেছেন তা প্রকৃত স্বাধীনতার বিধিনিয়ম। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, " কি ধরনের স্বাধীনতা এটা ? সীমাবদ্ধতা মানে স্বাধীন নয়।"

তারা বোঝেন না খারাপ অভ্যাসগুলি অনুশীলন করলে তাদের ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়ে যেতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ একজন ধূমপায়ী বলতে পারে, "আমি ধূমপান করি, কারন আমি এটা পছন্দ করি, যা আমাকে আমার কাজে মনসংযোগ করতে সাহায্য করে, খুশীর আমেজ প্রদান করে। যখন দেখব, খারাপ লাগছে ছেড়ে দেব।" তারা এটা বলে শুধুমাত্র অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে। প্রকৃতপক্ষে এইধরনের লোকেরা তাদের অভ্যাসের দাস হয়ে পড়ে এবং জীবনে তা ছাড়তে পারে না। পাশ্চাত্যদেশের লোকেরা স্বাধীনতার নামে, অবাধ যৌনজীবন, মদ্যপান ইত্যাদিতে লিপ্ত হয় এবং ঐসব কার্যকলাপে অত্যধিক আসক্ত হয়ে পড়ে তাদের মন ঐ সব কাজে আরো বেশী অস্থির, উৎপীড়িত করে তোলে। পাশাপাশি তারা ভয়ঙ্কর সব রোগে যেমন এইড্‌স্, ক্যান্সার ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। অবশেষে এই সমস্ত পাপ কর্মের ফলে তাদের নরকের পথ প্রশস্ত হয়।

অলস মন শয়তানের কারখানা

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "আপনি আমাকে কতকিছু কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে বলছেন, তাহলে আমার কি করা উচিত ? আমি অলস নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারি না। আমাকে অবশ্যই কিছু না কিছু করতে হবে।" এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ইন্দ্রিয়গুলিকে শ্রেষ্ঠ পারমার্থিক কার্যকলাপে নিয়োজিত করা।

ইন্দ্রিয়সমূহ এতই বলবান এবং ক্ষোভকারী যে, তারা অতি যত্নশীল বিবেকসম্পন্ন পুরুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয়াভিমুখে আকর্ষন করে। (ভ: গী: ২/৬০) তাই মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে যদি কৃষ্ণভাবনাময় আদর্শ কার্যকলাপে নিয়োজিত করা না হয়, তাহলে তারা সহজেই জড় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যাবে। অনেক ঋষি, মুনি, দার্শনিক অধ্যাত্মবাদী আছেন, যারা ইন্দ্রিয়গুলোকে দমন করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁদের সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং তারা ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়েন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মতো যোগী, যিনি তার মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করবার জন্য গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন, তিনিও স্বর্গের অপ্সরা মেনকার রূপে মুগ্ধ হয়ে কামান্ধ হয়ে অধঃপতিত হন। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরকম অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণভক্তি ছাড়া মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করা অত্যন্ত কঠিন। মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিয়োজিত না করে, কেউই জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হতে পারে না।

ইন্দ্রিয় সমূহকে জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহার ও তাদের ভগবানের সেবায় নিয়োগ - দুটি বিষয় (Two Point Formula)

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঠিক বিপরীত ঘটনা আমরা দেখতে পাই শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জীবনে।

হরিদাস ঠাকুর সম্পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনামজপে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম জপ করতেন। হরিদাস ঠাকুরের দিব্য মহিমায় শত শত লোক তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাত।

সাধু বিদ্বেষী জমিদার রামচন্দ্র খান হরিদাস ঠাকুরকে অপদস্থ করার মানসে এক সুন্দরী বেশ্যাকে গভীর রাত্রে তাঁর কুটীরে পাঠাল।

হরিদাসকে বিচলিত করবার জন্য সেই বেশ্যা নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গি করতে লাগল এবং নিজ বক্ষস্থলের কাপড় সরিয়ে কুটীরের দুয়ারে বসে মধুর স্বরে বলতে লাগল — "ঠাকুর, তুমি পরম সুন্দর, এবং তোমার সুন্দর যৌবন, তোমাকে দেখে কোন নারী স্থির থাকতে পারে ? তোমার সঙ্গ সুখ উপভোগ করার জন্য আমার অন্তর লালায়িত হয়েছে। তোমাকে না পেলে আমি আমার প্রান ধারন করতে পারব না।"

হরিদাস ঠাকুর উত্তর দিলেন — "নিশ্চয় তোমাকে অঙ্গীকার

করব তবে সংখ্যাপূর্বক আমার নাম গ্রহণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বসে আমার নাম কীর্তন শ্রবন কর; তারপর নাম সমাপ্ত হলে আমি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করব।"

কিন্তু রাত্রি শেষ হয়ে এলে বেশ্যাটি বিচলিত হয়ে পড়ল, তখন হরিদাস ঠাকুর বললেন, 'আমি একমাসে এক কোটি নাম গ্রহণ করার সংকল্প করেছি, এই যজ্ঞ প্রায় শেষ হয়ে এল। কিন্তু সারারাত জপ করেও কোটি নাম গ্রহন সমাপ্ত হল না। কাল অবশ্যই সেই ব্রত সমাপ্ত হবে, এবং তখন স্বচ্ছন্দে আমি তোমার সঙ্গ উপভোগ করব।"

বেশ্যাটি তখন চলে গেল এবং পরের দিন সন্ধ্যা হতে না হতেই হরিদাস ঠাকুরের কাছে গেল, সারারাত ধরে হরিদাস ঠাকুর 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করলেন, এবং এইভাবে রাত্রি ভোর হল। ইতিমধ্যে (এইভাবে তিনদিন পর) হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ প্রভাবে বেশ্যার মন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

সেই বেশ্যা নির্মল হৃদয়ে হরিদাস ঠাকুরের পাদপদ্মে নিপতিত হয়ে ক্রন্দন করে বলতে লাগল, "আমি অনেক পাপ করেছি, হে প্রভু কৃপা করে আমাকে নিস্তার করুন। আমি কিভাবে এই জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারি।" হরিদাস ঠাকুর তখন তাকে বললেন — "তুমি নিয়মিত ভাবে 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন কর, তুলসী সেবা কর, অচিরেই তুমি ভক্তি লাভ করবে।" হরিদাস ঠাকুর বেশ্যার দ্বারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, অপরপক্ষে সেই বেশ্যা এক মহান ভক্তে পরিনত হলেন। যখন কেউ ভক্তিমূলক সেবায়

(কৃষ্ণভাবনাময় জীবনে) নিয়োজিত হন, তখন জড় আসক্তি দূর হয়ে যায়। ভগবান কৃষ্ণ গীতায় বর্ণনা করেছেন— কিভাবে পাপ কর্মগুলি পরিত্যাগ করার পাশাপাশি ইন্দ্রিয় ও মনকে তাঁর সেবায় নিয়োজিত করার মাধ্যমে আমাদের চেতনাকে কৃষ্ণভাবনাময় রাখা যায়। ভ: গী: ২/১৬ শ্লোকে তিনি বলেন —

তানি সর্বানি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর:।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।

যিনি সম্পূর্নরূপে সংযত চিত্তে আমার প্রতি উত্তমা ভক্তিপরায়ন হয়ে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্নরূপে বশীভূত করেছেন, তিনিই স্থিতিপ্রজ্ঞ।"

আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে অনুকুল পারমার্থিক কার্যকলাপে নিয়োজিত করাই তাদের নিয়ন্ত্রন করার নিশ্চিত সহজ উপায়। বৈদিক যুগে ধর্মপরায়ন রাজারা প্রজাদের নিকট কর আদায় করে তা কৃষ্ণভাবনা প্রচারে নিয়োজিত ভক্তদের সাহায্য করতেন। তারা ভগবানের মন্দির নির্মান করতেন যা বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়। নগরের কেন্দ্রস্থলে বিরাট মন্দির নির্মিত হত যেখানে অনেক লোক একত্রে সমবেত হয়ে পারমার্থিক শিক্ষা লাভ করতে পারতেন। এই সমস্ত রাজারা কেবলমাত্র বিশ্বজুড়ে কৃষ্ণভাবনা প্রসারে সাহায্যই করতেন না, তাঁরা নিজেরাও অত্যন্ত কঠোরভাবে নিজেদের জীবনে ভক্তি অনুশীলন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন যাতে তা অনুসরণ করে সাধারন মানুষও পারমার্থিক অগ্রগতি লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে পারে। এইরকম একটি

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত (যা ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে) হলেন মহানভক্ত অম্বরীষ মহারাজ, যিনি নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করে কামনা বাসনাকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সমস্ত সমস্যার সমাধান

যখন আমরা আমাদের প্রধান কর্তব্য ভগবানের সেবা ভুলে যাই, তখন জোর পূর্বক আমাদের হৃদয়ে কাম, ক্রোধ আদির সেবা করতে হয় যা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন আমরা ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভুলে গিয়েছি এবং তাই বৈদিক সাহিত্যে যোগ-পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে যার সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের প্রেমময়ী সম্পর্কের পুনর্জাগরন ঘটাতে পারি। ভগবানকে লাভ করার বিভিন্ন যোগ প্রনালী রয়েছে। কিন্তু বর্তমান এই কলহ ও প্রতারনার যুগ কলিযুগে একমাত্র প্রনালী ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা। বৃহন্নারদীয় পুরানে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে —

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যাথা।।

এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা ছাড়া আর অন্য কোনো গতি নেই, আর অন্য কোনো গতি নেই, আর অন্য কোনো গতি নেই।



সমস্ত সমস্যার সমাধান



জপ করুন

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে।।

এবং সুখী হউন।

মনের ত্রাণকারী হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের দ্বারা মনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারেন।

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র ঃ মনের মহা পরিত্রাতা।

'মন্ত্র' কথাটির অর্থ যা মনকে ত্রাণ করে। মহামন্ত্র অর্থাৎ মনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিত্রাতা। ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন ছাড়া আর কোনো কৃত্রিম পন্থা নেই যা আমাদের ভগবৎ চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটাতে পারে। জপধ্যান হচ্ছে অনুমোদিত ভগবৎনামের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন। এই প্রকার নাম জপ জপকারীর হৃদয় থেকে সমস্ত কলুষ দুর করে এবং শুদ্ধ পারমার্থিক চেতনায় উন্নীত করে। ভগবানের শত শত নাম রয়েছে, প্রতিটিই পূর্ণরূপে শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু কলিসন্তরণ উপনিষদে বলা হয়েছে—হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রই এই কলিযুগের জন্য অনুশীলনীয়। নিজেকে কলিযুগের কলুষ থেকে মুক্ত রাখতে হলে এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। যুগধর্ম হিসাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মতো অন্য কোনো মহান পন্থা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র গ্রন্থে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যখন আপনি কোনো ঔষধের দোকানে যাবেন, যদিও সেখানে শত শত প্রকার ঔষধ পাওয়া যায়, তবুও কেবলমাত্র আপনার ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ঔষধই আপনি নেবেন। অনুরূপভাবে এই নির্দিষ্ট যুগ কলিযুগের জন্য হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রই অনুমোদিত। এই অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গের (ভগবানের দিব্য নামের) প্রভাব সার্বজনীন নীতি। যেমন পদার্থ বিদ্যার 'মাধ্যাকর্ষণ সূত্র' বা অন্য কোনো সূত্র।

যিনি যত্নসহকারে নাম জপ অনুশীলন করবেন, নিঃসন্দেহে

উচ্চতর সুখ এবং মনের শান্তি অনুভব করতে পারবেন।

মানসিক একগ্রতা লাভ করতে হলে অবশ্যই বেশ প্রশান্ত ও উৎফুল্ল থাকতে হবে। সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, প্রবীনদের প্রতি শ্রদ্ধা, অধস্তন নবীনদের প্রতি সহৃদয়তা এবং দুর্ব্যবহারকারী পাপীদের প্রতি উদাসীনতা অনুশীলনের ফলে মন থেকে ঈর্ষা, দ্বেষ ও বিতৃষ্ণা বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং ভক্ত শান্ত, সুখী ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠবেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, জনসঙ্গ বর্জন, দৃঢ়সংকল্প বিচক্ষনতা ও অনাসক্তির মাধ্যমে ভক্ত মানসিক একাগ্রতা বৃদ্ধি করতে পারেন।

মনকে বশীভূত করে একাগ্র করা সহজসাধ্য হয়। ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে নিয়মিত অভ্যাস ও অনুশীলনের ফলে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম সমূহ ও লীলা স্মরণে তন্ময়তার স্তর লাভ করা যায়। মন্ত্র জপ ও অভ্যাসের দ্বারা স্মরণ শক্তি বর্ধিত করা যায়।





মৃত্যুর পরে জীবন



কল্পনা না বাস্তব......

সমগ্র বিশ্ব এই ভ্রান্ত মোহে কর্মমুখর যে আমরা হচ্ছি এই দেহ। মানুষের সমগ্র কাজকর্মই তাদের জড় শরীরকে ঘিরে আবর্তিত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রথম যে বিষয়টি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, তা হচ্ছে, "আমরা এই দেহ নই, আমরা চিন্ময় আত্মা।" এমনকি সামান্য একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব যে আমরা এই দেহ নই।

আত্মা প্রকৃতপক্ষে কি ?

আত্মা হচ্ছে জীবনী শক্তির এক চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ যা প্রত্যেকটি দেহকে ক্রিয়াশীল করে, সেটিকে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে সক্ষম করে, ঠিক যেমন ইলেকট্রন কণার স্রোত তামার তারের মধ্যে প্রবাহিত হবার সময় শক্-এর সৃষ্টি করে। দেহকে একটি গাড়ীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, আর আত্মাকে তুলনা করা যায় গাড়ীটির চালকের সংগে। আত্মা সেই জীবনের এক স্ফুলিঙ্গ, যার উপস্থিতির ফলে দেহকে জীবন্ত বলে মনে হয়, আর যখন আত্মা দেহটি ছেড়ে চলে যায়, তখন আমরা বলি যে লোকটি 'মৃত'।

আত্মার অস্তিত্বের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ

আমরা কেবল জড় পদার্থ ও শক্তির সংগে সমন্বিতভাবে

'বিজ্ঞান' শব্দটিকে বুঝতে অভ্যস্ত। কিন্তু আরো এক উচ্চতর মাত্রার বিজ্ঞান রয়েছে, যা আত্মা ও অ-জড়, চিন্ময় শক্তি সম্বন্ধে আলোকপাত করে। আত্মা স্বরূপতঃ জড়াতীত, চিন্ময়, অপ্রাকৃত বস্তু। অন্য কথায়, আত্মা মূলগত ভাবেই জড় ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষণের পরিধির অতীত। জড়বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক কলাকৌশলগুলি আত্মার অস্তিত্ব 'প্রমান' করার জন্য অনুপযুক্ত, ঠিক যেমন কানের দ্বারা আলোর অনুভব লাভের চেষ্টা বৃথা। কিন্তু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের নিয়মবিধির অনুসরণের মাধ্যমে একে এক উচ্চতর বাস্তবতা বলে উপলব্ধি করা যায়। চরমে, সমগ্র পারমার্থিক সত্যই প্রকাশিত ও 'প্রমাণিত' হয় আভ্যন্তরিকভাবে, অনুভবের মাধ্যমে। তবু আত্মার উপস্থিতি উপলব্ধিতে নীচের বিষয়গুলি আমাদের সাহায্য করতে পারে।

১। সাধারণ জ্ঞান

যখন কেউ মারা যায়, আমরা বলি "উনি চলে গেলেন" এখন, কে চলে গেলেন ? ব্যক্তিটির শরীর তো এখনো সেখানে শায়িত রয়েছে ? সত্যটি হচ্ছে এই যে জীবনের উৎস আত্মা দেহটি ছেড়ে চলে গিয়েছে, এবং সেজন্য ব্যক্তিটিকে এখন বলা হচ্ছে মৃত।

২। উপলব্ধি জাত ধারণা

আমাদের প্রত্যেকেরই একটি স্বাভাবিক বোধ রয়েছে যে প্রকৃত সত্তা বা ব্যক্তি, 'আমি' দেহ, মন ও বুদ্ধি থেকে আলাদা, পৃথক। আমরা বলি "আমার মাথা" ইত্যাদি। এইভাবে আমরা দেহটির উপরের মাথার চুল, থেকে শুরু করে পায়ের ডগা পর্যন্ত 'আমার এটা, সেটা' বলে অভিহিত করতে পারি। এটি নির্দেশ করছে যে ঐসব বস্তুগুলি কোনো একজনের, কোনো মালিকের। চোখ, কান বা মস্তিষ্ক হচ্ছে কেবল কতকগুলি যন্ত্র, যেগুলির মাধ্যমে "আমরা" দেখি, শুনি, অথবা চিন্তা করি। এইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলি নিজেরা কোনো কিছু করতে পারে না। এমনকি একটি মৃতদেহেরও মস্তিষ্ক রয়েছে, কান রয়েছে, চোখ রয়েছে কিন্তু সেগুলি অকেজো, ক্রিয়াশক্তিরহিত। চালক, অর্থাৎ আত্মা এই দেহ-রূপ যানটিকে পরিত্যাগ করেছে বলেই এইসব যন্ত্রের কাজকর্ম সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

৩। চেতনা (Consciousness)

জীবন্ত দেহে রয়েছে চেতনা। ঠিক যেমন সূর্য তার চতুর্দিকে তাপ ও আলোর রশ্মি বিকিরণ করে, তেমনি আত্মাও সমগ্র দেহে চেতনা পরিব্যাপ্ত করে — পায়ের ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত, সর্বত্র। দেহে পরিব্যাপ্ত এই চেতনাই আমাদেরকে চিন্তা, অনুভব বা চলাফেরা করতে সক্ষম করে। অতএব চেতনা হচ্ছে আত্মার লক্ষণ। চেতনার অস্তিত্বই একটি মৃত দেহের সঙ্গে জীবন্ত দেহের পার্থক্য সূচিত করে। এমন একটি যন্ত্র সহজেই তৈরী করা যেতে পারে, যেটির সামনে লাল আলো পড়া মাত্রই সেটি সাড়া দেয় ও তার থেকে এক তথ্য লেখা কাগজের টেপ বেরিয়ে আসে ;

"আমি লাল আলো দেখছি", কিন্তু এই যান্ত্রিক সাড়া বা প্রক্রিয়ার মধ্যে কি সত্যি সত্যি কোনো অনুভবের স্পন্দন আছে, যা একটি চেতন জীব উপলব্ধি করে — যেমন কোনো মানুষ প্রভাতের রক্তিম সূর্যোদয় দেখে অনুভব করে ? টমাস হাক্সলি যেমন যথার্থই বলেছেন, "এই বিশ্বে একটি তৃতীয় পদার্থ রয়েছে, অর্থাৎ চেতনা, যাকে আমি আদপেই কোনো জড় পদার্থ বা শক্তি বলে মনে করি না।" এই চেতনার অস্তিত্ব আত্মার অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে।

৪। আসন্ন-মৃত্যুর অভিজ্ঞতা (N.D.E— নিয়ার ডেথ-এক্সপিরিয়েন্স)

গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হয় যে মন জড়ীয় মস্তিষ্ক ও দেহ হতে স্বতন্ত্র। এন.ডি.ই-র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দেহাতিরিক্ত অভিজ্ঞতা বা **O.B.E.** (আউট-অব-বডি এক্সপিরিয়েন্স, যেখানে বিভিন্ন মানুষ তাদের নিজেদের দেহ ও অন্যান্য দেহসংক্রান্ত ঘটনাবলীর কথা জানাচ্ছেন যা দেহাতীত কোন পটভূমিতে থেকে পর্যবেক্ষণ করা— তাদের গুরুতর অসুস্থতা, দৈহিক যন্ত্রণা বা অপারেশনের সময়, যখন তাদের দেহ থাকে অজ্ঞান বা 'অচেতন'। এর আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একজন হৃদরোগী শল্য চিকিৎসার পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে অপারেশনকালীন সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিচ্ছেন, যেন বাইরে থেকে তিনি সেসব দেখেছেন। এইরকম অনুভবের সময় মেডিক্যাল অভিমত অনুসারে তার মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যায় — যন্ত্রে ব্রেন-ওয়েভের রেখাচিত্র বা গ্রাফের রেকর্ড থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়, এবং ঐ রোগী তখন অজ্ঞান অবস্থায় থাকেন।

এন.ডি.ই নিয়ে পরিপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত, নিখুঁত গবেষনা করে বহু ব্যক্তি তাদের রিসার্চ-রিপোর্ট উপস্থাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, এমরি ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুলের প্রফেসর ও কার্ডিওলজিস্ট ডকটর মাইকেল বি. স্যাবম, প্রথমে এন.ডি.ই - সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সন্ধিগ্ধ; কিন্তু ঐগুলির সত্যতা তদন্ত করে দেখার পর তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। কঠোর রিসার্চ-এর ভিত্তিতে ডকটর স্যাবম লেখেন, "মানুষের মস্তিষ্ক যদি এই দুটি মৌলিক উপাদান দিয়ে নির্মিত হয় — 'মন' ও 'মস্তিষ্ক', তাহলে বহু মানুষের মৃত্যুকালীন অভিজ্ঞতার ঘটনা কি অত্যন্ত অস্থায়ী সময়ের জন্য হলেও মন ও মস্তিষ্কের বিচ্ছিন্নতাকেই প্রদর্শন করে না ? এই দেহাতীত অভিজ্ঞতার জবানবন্দী আসলে প্রচলিত ধর্মীয় তথ্যের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়। সেই মন, যা শরীরস্থ মস্তিষ্ক হতে বিমুক্ত হয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে — সেটি কি আসলে মূলগতভাবে আত্মা হতে পারে, চরমে জড় শরীরের বিনাশের পরেও যার অস্তিত্ব থাকে অব্যাহত, ঠিক যেমন কিছু কিছু ধর্মীয় মতবাদে বলা হয়ে থাকে ? আমার মনে হচ্ছে যে এই সব এন.ডি.ই-র রিপোর্টগুলি যে চরম প্রশ্নটিকে তুলে ধরেছে, এ হচ্ছে সেই প্রশ্ন।"

৫।পূর্বজন্মের স্মৃতি

বহু নিষ্ঠাবান গবেষক এই পূর্বজন্মের স্মৃতির উপর নিরপেক্ষ কঠোরও নিয়মানুগভাবে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার সাইকিয়াট্রির অধ্যাপক ঈয়ান স্টিভেনসন শিশুদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথিত তাদের পূর্বজন্মের স্মৃতির উপর ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। শিশুদের দেওয়া তাদের পূর্ব জন্মের জন্মস্থান, তাদের পূর্ব নাম ও চেহারা, তাদের স্বজন-বর্গের ও অন্যান্য পরিচিতদের নাম পুনর্জন্মের সত্যতাকেই হুবহু সমর্থন করে। প্রফেসর স্টিভেনসন বহু সংখ্যক ঘটনার-বিবরণী একত্রিত করে সেগুলির সত্যতা যাচাইয়ে ব্রতী হন এবং সেই সাথে কোন প্রকার জালিয়াতি যাতে না হতে পারে সে ব্যাপারে তিনি কঠোর সতর্কতা গ্রহণ করেন। তাঁর গবেষণা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপন করে যে চেতন আত্মা একটি জড় শরীর থেকে অপর একটি জড় শরীরে গমন করতে পারে, দেহান্তরিত হতে পারে। স্পষ্টতঃই, যখন একটি দেহের মৃত্যু হয় তখন তার মস্তিষ্কের কোষগুলি নষ্ট হয়ে যায়, এবং কোন রকম বাহ্যিক প্রক্রিয়ার সাহায্যেই সেগুলি অন্য আরেকটি মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করতে পারে না, সেইজন্য কখনই কোন মৃত মানুষের স্মৃতি কোনো শিশুর মস্তিষ্কে শারীরিকভাবে সঞ্চারিত হবার বা করবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সেজন্য একটি শিশুর পূর্বজন্মের স্মৃতিচারণ এটিই প্রমাণ করে যে ঐ দেহস্থ

ব্যক্তি আগের জন্মে ঐ পূর্বেকার দেহটি ব্যবহার করেছে, যার কিছু স্মৃতি সে অভিব্যক্ত করতে পারছে। অতএব সরলার্থ হচ্ছে এই যে চেতন আত্মা অবশ্যই এমন একটি সত্ত্ব যা দেহস্থ মস্তিষ্ক থেকে পৃথক।

জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপলব্ধি।

যদিও উপরোক্ত ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলি দেহের মধ্যে এক চেতন সত্ত্বার উপস্থিতিকে প্রতিপন্ন করে, তবুও এই ধরণের অনুমানমূলক পদ্ধতির নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যদি কেউ এইরকম প্রতীক্ষায় থাকেন যে বিজ্ঞান একদিন আত্মার স্বরূপ এবং গুণ-বৈশিষ্ট সম্বন্ধে পরিপূর্ণ উপলব্ধি প্রদান করবে, তাহলে তাঁকে সম্ভবতঃ কোটি বছর অপেক্ষায় থাকতে হবে। বিজ্ঞান হচ্ছে একটি শিশুর অ্যাডভেঞ্চারের মতো, পক্ষান্তরে সনাতন ধর্ম হচ্ছে শিষ্য-পরম্পরায় প্রবাহিত ভগবানের শাশ্বত ও পূর্ণ বাণী। আমরা জীবন ও মৃত্যু কি সে-বিষয়ে কোন রকম মানসিক জল্পনা ছাড়াই শাস্ত্র থেকে সুস্পষ্ট তথ্য পেতে পারি।

আত্মা-সম্পর্কিত জ্ঞান

আত্মা অবিনশ্বর ঃ

শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ।।

অর্থাৎ "আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, অথবা হাওয়াতে শুকানোও যায় না।"

(ভঃ গীঃ ২/২৩)

আত্মা একজন ব্যক্তি ঃ

প্রত্যেক আত্মাই পৃথক পৃথক চেতনা-সমন্বিত এক একজন ব্যক্তি। আপনি আপনার দেহ, মন, বুদ্ধি ও মিথ্যা অহঙ্কার সম্বন্ধে সচেতন। আপনার মাথাব্যথা আমি অনুভব করতে পারি না, আবার আমি কি চিন্তা করছি আপনি তা জানেন না। কিন্তু ভগবান সৃষ্টির প্রত্যেকটি কণিকা সম্বন্ধে সচেতন;

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যাম সর্বে বয়মতঃপরম্ ।।

"এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি এবং এই সমস্ত

রাজারা ছিল না; এবং ভবিষ্যতেও কখনো আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না" (ভ. গী. ২/১২)।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত সনাতন...',
'এই জড়জগতে বদ্ধজীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ..."

(ভ. গী. ১৫/৭)।

আত্মার রূপ রয়েছে ঃ

আত্মা 'নিরাকার নির্গুণ জ্যোতি' 'শূন্য' কিছু নয়, কিছু মানুষ যেমন ভুল করে ভেবে থাকেন। আত্মা হচ্ছে এক সুন্দর ব্যক্তিত্ব, যার দেহ সৎ-চিৎ-আনন্দময়। আত্মা কেবল শক্তি মাত্র নয়, আত্মা একজন পূর্ণচেতন ব্যক্তি।

আত্মা শাশ্বত ঃ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন ঃ—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা নঃ ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরানো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।।

'আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয়না। অথবা পুনঃপুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না ; তিনি জন্মরহিত শাশ্বত, নিত্য এবং নবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না" (ভ. গী. ২/২০)।

আত্মার একটি শরীর রয়েছে, যা সৎ (নিত্য, শাশ্বত), চিৎ (জ্ঞান), আনন্দময় ঃ

আত্মা এই জড়জগতে এসেছে ভগবৎ-ধাম থেকে, আর এজন্য ভগবদ্ধামে ভগবানের সংগে প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধিত হবার উপযোগী আত্মার একটি শাশ্বত, জ্ঞানময় শরীর রয়েছে, যা চিন্ময় — অর্থাৎ পূর্ণচেতন। কিন্তু আত্মা যখন একজন স্বাধীন ভোক্তা হতে আকাঙ্খা করে, তখন তাকে জড় জগতে প্রেরণ করা হয়, যেখানে তাকে একটি জড় শরীরে আবদ্ধ হতে হয়। এটা হচ্ছে ঠিক একটি টিয়া পাখীর (আত্মা) খাঁচায় (জড় দেহে) আবদ্ধ হওয়ার মতো। কেন আমরা দুর্দশা ভোগ করি ? কারণ সচ্চিদানন্দময় আত্মা এমন একটি দেহে আবদ্ধ হয়েছে যা অসৎ-অচিৎ-নিরানন্দ, সুতরাং চিদ্‌রূপময় আত্মার ক্ষণস্থায়ী জরা-ব্যাধিগ্রস্ত জড়শরীরে অবস্থান অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আর সেজন্যই আমাদের দুঃখ ভোগ করতে হয় — আমাদের যাবতীয় দুর্দশার এটিই মূল কারণ।

আত্মার অবস্থান হৃদয়-প্রদেশে ঃ

আত্মা সারা দেহকে চেতনা দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে, ঠিক যেমন একটি বাতি সারা ঘরকে আলোয় ভরে দেয়। সারা ঘরকে যে বাতিটি আলোকোজ্জ্বল করে তুলছে, সেই বাতিটি ঘরের একটি কোণে থাকতে পারে। ঠিক তেমনি আত্মা হৃদয়-প্রদেশে (হৃৎ-

পিণ্ডে) অবস্থান করেও সারা দেহে চেতনা পরিব্যাপ্ত করে। হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনের সময় আত্মাকে দেহ থেকে সরানো যায় না, কেননা আত্মা চিন্ময় (অ-জড়)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন একটি গাড়িটি থেকে স্টেপনী কিংবা রেডিয়েটর সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন ঐ গাড়ীতে বসে থাকা চালকের কিছুই হয় না। ঠিক তেমনি একটি-হৃৎপিণ্ড (যে কেবল রেডিয়েটরের মতো একটি রক্ত-সঞ্চালনকারি যন্ত্র) অন্য আরেকটির দ্বারা প্রতিস্থাপন করলেও শরীরস্থ আত্মা তাতে প্রভাবিত হয় না।

আত্মা দেহ-পরিবর্তন করে ঃ

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।''

'মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করেন' (ভ.গী. — ২/২২)।

'দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।'

''দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনো এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না (ভ.গী. — ২/১৩)।''

আত্মার আয়তন ঃ

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এবং শ্রীমদ্ভগবতে বীজ-রূপে জড়দেহে বিরাজিত আত্মার আয়তন বর্ণিত হয়েছে। যেমন শ্বেতাশ্বতর উপ-৫৯-এ বলা হয়েছে—

'বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরাশ্রুতি।।''

কেশাগ্রের শতভাগকে শতভাগে ভাগ করলে তার যে আয়তন হয়, আত্মার আয়তনও ততখানি।' এই হচ্ছে আত্মার বীজ-রূপী আয়তন। আত্মা জড়-ব্রহ্মান্ডে নানা শররে ভ্রমনকালে তার এই আয়তন থাকে। কিন্তু চিন্ময় জগতে ভগবদ্ধামে আত্মার একটি আদি, অপরূপ-সুন্দর সচ্চিদনন্দময় অর্থাৎ নিত্য, আনন্দময় ও জ্ঞানময় দেহ রয়েছে, যাকে বলা হয় আত্মার 'স্বরূপ' (আত্মার আদি নিত্য-সনাতন স্বরূপদেহ); পক্ষান্তরে জড় জগতে বদ্ধবস্থায় আত্মার জড় শরীরকে বলা হয় বিরূপ বা বিকৃত জড়-রূপ)। তার নিত্য চিন্ময় স্বরূপে প্রত্যেক আত্মার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংগে নিম্নোক্ত পাঁচটি রসের যেকোন একটিতে এক শাশ্বত মধুর সম্পর্ক রয়েছেঃ শান্ত রস, দাস্য রস, সখ্য রস, বাৎসল্য রস এবং মাধুর্য - রস।

আত্মা অচিন্ত্য ঃ

চুলের অগ্রভাগের দশ হাজার ভাগের একভাগ এতই

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যে এমনকি বর্তমানের সবচেয়ে শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপেও তা দেখ অসম্ভব। কিন্তু আমরা যদি এমনকি এই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের থেকেও অনেক শক্তিশালী কোনো অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারে সক্ষম হই, এবং তার মধ্য দিয়ে আত্মাকে দেখার চেষ্টা করি, তবুও আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। আমরা এমনকি আমাদের চিন্তাকেও দর্শন করতে পারি না, তা পরিমাপ করতে পারি না। এমনকি মনও-- যা হচ্ছে জড়ের সূক্ষ্ম রূপ-- আমাদের কাছে অদৃশ্য, দৃষ্টির অগোচর, অব্যক্ত। সংজ্ঞানুযায়ী আত্মা মনেরও অতীত। এটি কেবল অব্যক্তই নয়, আত্মা অচিন্ত্য, অচিন্তনীয়। আপনি এমনকি এর-চিন্তাও করতে পারেন না ঃ

অব্যক্তোহ্যয়ম্ অচিন্তোহ্যয়ম অবিকার্যহয়মুচ্যতেঃ,

''এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী বলে শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে।'' (ভ.গী.—২/২৫)।

বিবর্তন-এর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ঃ

বিভিন্ন প্রজাতির শরীরের মধ্য দিয়ে আত্মার অভিযাত্রাকে বলা হয় পারমার্থিক বিবর্তন। কিভাবে তা ঘটে? প্রজাতির দেহ-গুলির বিবর্তন ঘটে না; ৮৪ লক্ষ জীব-প্রজাতি ব্রহ্মান্ডের গ্রহগুলি সৃষ্ট হবার পর উচ্চতর কর্তৃপক্ষের (ব্রহ্মার) অধ্যক্ষতায় যুগপৎ প্রকশিত হয়। নিম্নতর হতে উচ্চতর জীব-শরীরের মধ্য দিয়ে

জীব-সত্ত্বগুলি ভ্রমন করতে থাকে, তারা চেতনা বিকাশের সাথে সাথে উচ্চতর দেহ প্রাপ্ত হয়। এটিই হচ্ছে পারমার্থিক বিবর্তন।

শাস্ত্রের মাধ্যমে জীবাত্মার এই পারমার্থিক বিবর্তন যথাযথভাবে উপলব্ধি করা কর্তব্য। স্বরূপতঃ জীবসত্তা হচ্ছে একজন জড়াপ্রকৃতির সঙ্গেবরহিত চিন্ময় জীব, কিন্তু যখন সে জড়জগৎ ভোগে উন্মুখ হয়, তখন সে জড়জগতে অধঃপতিত হয়। এরপর সে জলচর, উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, পাখী, পশু প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ প্রজাতি শরীরে জন্ম-মৃত্যু ভোগ করতে করতে মানব দেহ লাভ করে ও শাশ্বত জগতে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে আপন নিত্য স্বরূপে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়। এই সুযোগের অপচয় করলে পুনরায় নিম্নতর প্রজাতি-দেহে অধঃপতিত হতে হয়। অর্থাৎ, চেতনার বিবর্তন অনুসারে জীবাত্মা উন্নততর শরীর লাভ করতে থাকে। মানব শরীর কেবল ভগবদুপলব্ধির জন্য, আত্মজ্ঞান লাভের জন্য – পশুদের অনুকরণের জন্য নয় ; তাহলে বিবর্তনের বিপরীত পথে আবার পশুদেহ কিংবা উদ্ভিদ দেহে আবর্তিত হতে হয় (শ্রীমদ্ভাগবত – ৪/২২, ৯/৪)।

বিভিন্ন জীব-প্রজাতির মধ্যে মানব-প্রজাতিতে দেহলাভ এক দুর্লভ সুযোগ। ভগবৎচেতনা লাভের দ্বারা এই সুযোগের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে :

অশিতিং চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তাঞ্জীবজাতিষু
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রপ্যং মনুষ্যং জন্মপর্যায়াৎ।

তদপ্যাফলতাং জাতঃ তেষামাত্মাভিমানিনাম্
বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ম্।।

"ক্রমবিকাশের ক্রমিক পর্যায়ে চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করার পর জীব মনুষ্য দেহ লাভ করে। এত দুর্লভ এই মনুষ্য জন্ম পেয়েও গন্ড মূর্খ ব্যক্তিরা শ্রীগোবিন্দের চরণকমল-যুগলের আশ্রয় গ্রহণ না করে তা হেলায় নষ্ট করে।"

জীববিজ্ঞানীরা "প্রজাতি" বলতে যা ধারণা করেন, তার সংগে শাস্ত্রোক্ত যোনি বা প্রজাতির পার্থক্য রয়েছে। বিজ্ঞানীরা "প্রজাতি" শব্দের দ্বারা কেবল কোনো নির্দিষ্ট ধরণের জীব-শরীরের বাহ্যিক চেহারা বা কেবল স্থুল অঙ্গ-কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যকে বোঝান। বৈদিক শাস্ত্রে এই বিষয়টি নির্ধারণ করা হয় জীবের চেতনার স্তরের ভিত্তিতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জীববিজ্ঞানীদের মতানুসারে মানুষ কেবল একটি প্রজাতি, পক্ষান্তরে বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে চার লক্ষ প্রজাতির মানুষ রয়েছে।

অন্য কথায়, চেতনার বিভিন্ন স্তর অনুসারে চার লক্ষ পর্যায়-ক্রমের মানুষ রয়েছে। চেতনার নিম্নতর অবস্থায় একটি জীবসত্তা মানবদেহে অবস্থান করেও প্রায় পশুদের মতো অচরণ করে। আরেকটু উন্নত স্তরে, তার চেতনা কিছুটা বিকশিত হলে সে হয়ত তার নিজ স্বার্থের ক্ষুদ্র গন্ডির বাইরে এসে তার পরিবারের স্বার্থের কথা ভাবতে থাকে, পরিবারের সদস্যদের সুখের জন্য ত্যাগ-স্বীকার করে। আরো উচ্চতর স্তরে সে তাঁর গোষ্ঠীর মানুষের কথা, তারপর তার রাজ্য ও দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে। তারপর চেতনার উন্নততর অবস্থায়

সে হতে পারে একজন মানবতাবাদী — বিশ্বমানবের কল্যাণব্রতী। তরপর, বহু জন্ম ধরে চেতনার উপযুক্ত বিকাশের পর সে উপলব্ধি করতে পারে যে সকল জীবসত্তার উৎস, আশ্রয়, পরমগতি হচ্ছেন ভগবান, এবং তাঁকে ভালবাসাই পরম স্বার্থ, জীবনের পরম সর্থকতা। এরপরও বহু জন্ম ধরে দেবদেবী ও ভগবান সম্বন্ধে ধরণার ক্রমবিবর্তন চলতে থাকে। এই বিকাশ-ক্রিয়া তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন সে জানতে পারে যে ভগবান হচ্ছেন বাসুদেব, কৃষ্ণ; তিনি সর্বকারণের কারণ।

চেতনা যতদিন না পূর্ণবিকশিত হয়, ততদিন বিভিন্ন শরীরে জন্মান্তর চলতেই থাকে। জন্ম-মৃত্যুর এই অন্তহীন পুনরাবৃত্তি স্তব্ধ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই জড়া প্রকৃতির গুণময়ী আবরণ হতে বিমুক্ত হয়ে নির্মল, শুদ্ধ চেতনায় অধিষ্ঠিত হতে হবে। সেজন্য যদি আমরা মানব শরীর লাভ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের অপ্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা না করি, তহলে মৃত্যুর পর অবশ্যম্ভাবীরূপে আমাদের অন্য আরেকটি জীব-শরীরে দেহান্তরিত হতে হবে— বর্তমানের থেকে ভাল বা মন্দ যেকোন শরীরে।

বিভিন্ন ধরণের জীব-শরীরের উদ্ভব হয় জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ— সত্ত্ব, রজ, ও তমোর বিভিন্ন মাত্রার সমন্বয় ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে। বিভিন্ন ধরণের জীব-শরীর ঠিক বিভিন্ন আকার-আয়তনের, বিভিন্ন রঙের অস্থায়ী বাড়ী বা ঘরের মতো, যার মধ্যে শাশ্বত সত্তা, জীবাত্মা কিছুকালের জন্য বাস করে থাকে। একটি শহরে যেমন বিভিন্ন ধরণের বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়, ভাড়া দেবার ক্ষমতা অনুসারে

কোনো মানুষ ভাল বা মন্দ কোন একটি বাড়ীতে প্রবেশ করে, তেমনি চেতনার অবস্থা, কর্মফল অনুসারে জীব-সত্তা কোন এক নির্দিষ্ট জীব-শরীরে প্রবেশ করে থাকে। সমস্ত প্রজাতির জীব-শরীর যুগপৎ সবসময়ই বিদ্যমান; ঠিক যেমন বিভিন্ন ধরণের বাড়ী সবসময়ই রয়েছে। জীবসত্তাসমূহ তাদের চেতনা-বিকাশের প্রয়োজন অনুসারে জীব-শরীরগুলি ব্যবহার করে থাকে। বাড়ী ভাড়া নেবার মূল্যের মতো জীবসত্তার জন্য উচ্চ-নিম্ন শরীরের কোনো একটি লাভের মূল্য হচ্ছে কর্ম। পুণ্য-কর্মপ্রভাবে উন্নত শরীর লাভ হয়, পুণ্যকর্মের অভাবে অনুন্নত শরীর লাভ হয়। কর্মফল অবশ্য কেবল মানবদেহেই সঞ্চিত হয়, পশুদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয় না।

পরমাত্মা ঃ জীবাত্মার বন্ধু ঃ

যখন জীবাত্মা এই জড় জগতে পতিত হয়, তখন তাকে নানা দেহে দেহান্তরিত করা, তার তত্ত্বাবধান করা এবং তাকে পথনির্দেশ দানের জন্য পরমপুরুষ ভগবানের এক প্রকাশ জীবাত্মার সঙ্গী হন। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকাশ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন — ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঃ র্জুন তিষ্ঠতি -- (ভ. গী. ১৮/৬১), এবং প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যেও তিনি প্রবেশ করেন (পরমাণুচয়ান্তরস্থং, ব্রহ্মসংহিতা-- ৩৫)। তাঁকে বলা হয় পরমাত্মা।

দুই প্রকারের আত্মা রয়েছে ঃ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চিৎ-কণ (অণু-আত্মা,

জীবাত্মা), এবং পরম আত্মা (বিভু-আত্মা, পরমাত্মা)। জীবাত্মার অর্থ একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা, পরমাত্মার অর্থ একজন পরম ব্যক্তিসত্তা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রয়েছে। উভয়েই ব্যক্তিত্ব সমন্বিত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, জীবাত্মা কেবল একটি বিশেষ দেহে আবদ্ধ, পক্ষান্তরে পারমাত্মা সর্বত্র বিরাজমান। কঠোপনিষদেও একথা সমর্থিত হয়েছে —

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিত গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদন্মহিমানমাত্মনঃ।।

"পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েই বৃক্ষসদৃশ জীবদেহের হৃদয়ে অবস্থিত। যিনি সব রকম জড় বাসনা এবং সব রকমের শোক থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন, তিনিই কেবল ভগবানের কৃপার ফলে আত্মার মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন।"

"পরমাত্মার কৃপার ফলেই অণু আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়। বন্ধু যেমন বন্ধুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে, পরমাত্মাও তেমনি অণু আত্মার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। মুণ্ডকোপনিষদ্ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আত্মা এবং পরমাত্মাকে একই গাছে বসে থাকা দুটি পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি পাখী (জীবাত্মা) সেই গাছের ফল ভক্ষন করছে, অপর

পাখীটি (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁর বন্ধুকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। এই দুটি পাখী গুণগতভাবে যদিও এক, (উভয়েই সচ্চিদানন্দময়, অ-জড়), তবুও তাদের একজন (জীবাত্মা) সেই জড়জগৎ-রূপ গাছের ফলের আকর্ষণে আবদ্ধ। কখনো সে তিক্ত ফল আস্বাদন করে শোক করছে, কখনো বা সে মিষ্টি ফল খেয়ে আনন্দ করছে। পক্ষান্তরে অন্যজন তার সখাটির কার্যকলাপ কেবল পর্যবেক্ষণ করে চলেছে।

পদ্মপুরাণ থেকে আমরা জানতে পারি যে এই ব্রহ্মাণ্ডে মোট ৮৪ লক্ষ ধরণের জীব-শরীর বা প্রজাতি রয়েছে; এদের মধ্যে ৯লক্ষ প্রজাতি হচ্ছে জলচর জীব, ২০ লক্ষ উদ্ভিদ প্রজাতি, কীট-পতঙ্গ হচ্ছে ১১ লক্ষ প্রজাতির, পাখী-প্রজাতি হচ্ছে ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ প্রজাতির, এবং মানুষ ৪ লক্ষ প্রজাতির। জীবসত্তা নানা প্রজাতির বিভিন্ন রকম জীব-শরীরে অবিরাম দেহান্তরিত হয়ে চলে, কিন্তু পরমাত্মা একান্ত সখার মতোই সর্বদাই তার সঙ্গে থাকেন; সেই জীবসত্তা মনবদেহে বা একটি কীট দেহে — যে দেহেই অবস্থান করুক না কেন, ভগবান সর্বক্ষণ তার সঙ্গে থাকেন।

জীবসত্তার বাসনা অনুসারে প্রকৃতি শরীর প্রদান করে

যে কোন বাসনার কথা ভাবুন ঃ

বেশি ঘুমানোর ইচ্ছা ঃ

প্রকৃতিতে এইরকম সুযোগ রয়েছে। মেরুতে বছরের ছয় মাস রাত্রি, আর সেখানে মেরুভালুকেরা সুনিদ্রার কি অপূর্ব সুবিধা পায়, তা সহজেই অনুমেয়। আর সাপ, ব্যাঙ-সহ বেশ কয়েক প্রজাতির সরীসৃপ বেশ কয়েকমাস একটানা শীত ঘুমে কাটায়। শ্লথেরাও দিনের অধিকাংশ সময় ঘুমে বুঁদ হয়ে থাকার জন্য বিশ্ব-প্রসিদ্ধ। যারা অলস ও বেশি ঘুমায়, তাদের জন্য প্রকৃতি এই সব শরীর নির্দিষ্ট রেখেছে। কারো কোনো ভৎর্সনা ছাড়াই মাসের পর মাস একটানা ঘুম।

অপরের শরীরের রক্ত ও মাংস খাবার ইচ্ছা ঃ

যার মাছ-মাংসের প্রতি প্রলুব্ধ হয়, তাদের জন্য বাঘ, সিংহ, শেয়াল প্রভৃতি বহু মাংসাশী প্রজাতি রয়েছে। কারও মাংসাহারের বাসনা থাকলে প্রকৃতি তাকে আমন্ত্রণ জানায়, "হ্যাঁ এসো। সিংহের দেহ গ্রহণ করো আর আজীবন মাংস ভক্ষণ করো!"

বেশিক্ষণ জলে থাকা আর সাঁতারের ইচ্ছা ঃ

আজকাল অনেককেই সাঁতারে অত্যন্ত অনুরক্ত দেখা যায়। একটা প্রাইজ পাবার আশায় তাঁরা পাগলের মতো দিনে ৭-৮ ঘন্টাই জলে পড়ে থাকে, দম শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পরিশ্রম করতে থাকে। কেউ কেউ তো আবার ইংলিশ চ্যানেলটাই সাঁতার কেটে পার হয়ে লোককে তাদের ক্ষমতা দেখায়। অন্য অনেকে আবার সমুদ্রের ঢেউয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সার্ফিং করে থাকে। এরকম সাঁতারুদের প্রকৃতি আমন্ত্রণ জানায়— 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলে এসো, এই হাঙর, তিমি, কিংবা মাছের দেহ নাও আর বিনা অসুবিধাতেই জলে পড় থাকো, সাঁতার কাটো!'

নীলাকাশে ওড়ার শখ হলে ঃ

পৃথিবী জুড়ে ওড়ার ক্লাব রয়েছে। আর ওড়ার কতরকম ফন্দিও বেরিয়েছে ঃ প্যারাসুট নিয়ে প্যারা গ্লাইডিং, অতিকায় ডানা যুক্ত গ্লাইডার, বেলুন, হেলিকপ্টার, প্লেন, রকেট — কত কি ! কত লোক রয়েছে, ওড়াই যাদের জীবন, জীবনের কেন্দ্রবিন্দু! প্রকৃতি তাদেরকে পাখীদের শরীর দেয়, যাতে যথেষ্ট ওড়ার সুযোগ পায় তারা !

নিরাবরণ থাকার প্রবণতা ঃ

কিছু মানুষ রয়েছে যারা উপযুক্ত পোশাক পরতে চায় না —

শরীরের বেশির ভাগ অংশ উন্মুক্ত রেখে তা বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। এইভাবে সভ্য মানবসমাজে তারা প্রতিনিয়ত ঘটায় ছন্দ পতন। পরজন্মে প্রকৃতি তাদের আমন্ত্রণ জানা, ' এসো, একটি গাছের দেহ গ্রহণ করো। এখানে এই বৃক্ষদেহে নগ্ন, নিরাবরণ হয়ে মনের সন্তোষে দাঁড়িয়ে থাকো কয়েকশো বছর, আর শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা — সমস্ত ঋতু উপভোগ কর !"

সুতরাং এইভাবে জীবজগতের প্রজাতির জীব-শরীরগুলি বিভিন্ন ধরণের সুখেভোগের সুবিধা প্রদান করে। আর বিভিন্ন জীবসত্তাদের বিভিন্ন রকম বাসনা অনুসারে তাদের এইসব শরীরগুলি প্রদান করা হয়।

প্রতিটি জীবসত্তার আদি বাসস্থান, নিত্য আলয় হচ্ছে শাশ্বত আনন্দময় চিন্ময় জগতে। সেখানে বাসোপযোগী তার একটি সুন্দর চিন্ময় আনন্দঘন নিত্য শরীর রয়েছে, যাকে বলা হয় 'স্বরূপ'। নানা শরীরে জীবাত্মার এইভাবে ভ্রমণের সময়েও স্বরূপ-দেহ নষ্ট হয় না। উদাহরণস্বরূপ, আপনাকে হয়ত কোন অস্ত্রোপচার করার জন্য বা কোন বৈদ্যুতিন যন্ত্র সারাই করতে, শীতের জন্য, কিংবা আন্যান্য নানা কাজের জন্য আপনার হাতকে ব্যবহার করতে হয়। এজন্য আপনি হাতে নানা ধরণের দস্তানা পরেন, বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে আপনি বিভিন্ন ধরণের দস্তানা ব্যবহার করেন, কিন্তু এতে আপনার হাতের কোনো পরিবর্তন

হয় না। ঠিক তেমনি জড় জগতে আত্মা একের পর এক জড় দেহ ধারণ করে চললেও আত্মার চিন্ময় শরীরটি, মূল শাশ্বত স্বরূপ সবসময়ই অবিকৃত থাকে।

মৃত্যুকালে কৃষ্ণ স্মরণ ঃ

কেউ হয়ত বলতে পারেন, "আচ্ছা, বেশ, আপনি বলছেন যে মৃত্যুকালে আমি যদি কৃষ্ণচিন্তা করি, তাহলে আমি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারব। তাহলে এটি যখন মৃত্যুকালের ব্যাপার, এখন তা-নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ কি ? এখন মন যা চায় তেমনি খুশিমতো ভোগবিলাসের মাধ্যমে জীবন উপভোগ করি। যখন মৃত্যুর সময় আসবে, তখন আমি দ্রুত কৃষ্ণে মন নিবিষ্ট করব এবং ফলে পরম ধামে ফিরে যাব। এইভাবে আমি উভয় জগতেরই পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করতে পারব।" যেসব মানুষ এইরকম চিন্তা করে, তারা নিজেদেরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকেই বুদ্ধিমান মনে করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রতারণা করা সম্ভব নয়। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে তিনি হচ্ছেন সমস্ত ছলনাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণকে প্রতারিত করার সাধ্য কার আছে ? যে-ব্যক্তি আজীবন জড় বিষয়াসক্ত থাকে, সে মৃত্যুকালে কখনো মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ করতে পারে না — এমনকি চেষ্টা করলেও নয়। যে ছাত্র পরীক্ষার জন্য সারা বছর কোনো রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি, তার পক্ষে স্টার নম্বর পাওয়া কিভাবে সম্ভব?

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করার আমাদের কোনো সামর্থ্য নেই, কেননা মৃত্যু এক অত্যন্ত মর্মন্তুদ যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা। আমরা যদি স্বাভাবিক অবস্থায় অবিরাম কৃষ্ণস্মরণ করতে সক্ষম না হই, তাহলে আমরা কি করে ভাবতে পারি যে মৃত্যুর মতো জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক, বিয়োগান্তক মুহূর্তে আমরা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মন নিবিষ্ট রাখতে পারব ? তা একপ্রকার অসম্ভব। কেবল শ্রীকৃষ্ণই এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন — আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে। যদি তাঁর সেবা করার জন্য আমাদের আন্তরিকতা দর্শন করে তিনি প্রীত হন, তাহলে মৃত্যু অত্যাসন্ন হলে তিনি আমাদের অনুগ্রহ করেন, আর তাঁর কৃপা-প্রভাবে আমরা ঐ চরম সময়েও তাঁর চিন্তায় মনোনিবেশে সমর্থ হই। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে পারমার্থিক জীবনের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন-প্রতিবন্ধকতা সহ্য করেও নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র —

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

জপ করে যাওয়া, যাতে জীবনান্তে আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের পূর্ণ ফল লাভ করতে পারি।

কর্মবন্ধন ও পুনর্জন্ম হতে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়

প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিগণ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন যে মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর অন্তহীন আবর্তন-চক্র হতে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। ''আর ফিরে এসো না'' তাঁরা আমাদের সতর্ক করেন। জড় জগতের কোন বদ্ধজীব যখন একটি জীবন সম্পূর্ণ করে, তখন পুনর্জন্মের নিয়ম অনুসারে তাকে পরবর্তীতে আরেকটি জীবন শুরু করতে হয়। প্রতি জীবনে সে জড়জাগতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে কর্ম করে, কিন্তু পরিণামে তার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়, এবং তাকে নূতন করে সব কিছু শুরু করতে হয়, অর্থাৎ আরেকটি দেহ ধারণ করে নূতন করে জীবন-সংগ্রাম শুরু করতে হয়। এইজন্যই এই জড় জগৎকে বলা হয় 'মৃত্যু-সংসার সাগর'। এই ভব সংসার অজ্ঞানতা ও মৃত্যুর এক অসীম মহাসাগর, যার মধ্যে আমরা নিপতিত হয়েছি। এই সংসার অরণ্যের মহাদাবাগ্নির মতো, যা আমাদের নিরন্তর দগ্ধ করছে। কিন্তু এই মৃত্যু-সংসারে-সাগরে কোটি কোটি বার জন্ম ও মৃত্যু-যন্ত্রনা অনুভবের কোনো বাধ্যতা নেই; এর থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার উপায় রয়েছে: যথাযথ সূত্র থেকে পারমার্থিক জ্ঞান, দিব্যজ্ঞান লাভ করা।

এই জ্ঞানের প্রথম ধাপ হচ্ছে, ''আমি এই দেহ নই; আমি শুদ্ধ

চিন্ময় আত্মা"— এইটি উপলব্ধি। দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানা এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা। একজন ব্যক্তি কেবল তখনই এই জ্ঞান যথাযথভাবে লাভ করতে পারেন, যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ হতে আগত প্রমাণিক পরম্পরাগত কোন সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুরুদেব তাঁর রুচি-বুদ্ধিকে পরিশীলিত করে কৃষ্ণ শরণাগতিতে প্রশিক্ষিত করে তোলেন, তখন ঐ ব্যক্তির মায়ামোহ অজ্ঞান-তামস বিদুরিত হয় এবং উজ্জ্বল পারমার্থিক দিব্যজ্ঞান লাভ করে তিনি সব কিছু উপলব্ধি করতে পারেন, সব কিছু তার নিকট যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়।

মন ও ইন্দ্রিয়গুলির তৃপ্তিসাধনের জন্য ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের কার্যকলাপ হচ্ছে জড়-বন্ধনের কারণ, এবং যতদিন কেউ এইরকম কার্যকলাপে বদ্ধ থাকে, ততদিন আত্মা নানা প্রজাতির দেহে দেহান্তরিত হতে থাকে। এটি অনিবার্য সত্য। যতদিন না কেউ জীবনের পারমার্থিক মূল্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হচ্ছে, অধ্যাত্ম-জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হচ্ছে, ততদিন অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা হতে উদ্ভূত দুঃখ-দুর্দশার কাছে পরাভব স্বীকারে তাকে বাধ্য হতে হবে। পুণ্যকর্ম বা পাপ কর্ম — যাই হোক না কেন, কর্ম করলেই তার ফল ভোগ করতেই হবে। কর্মকরলেই তার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় — ভাল কর্মের জন্য ভাল ফল, আর খারাপ কর্ম বা কুকর্মের জন্য কুফল, কিন্তু এই ফল ভোগের জন্য অব্যাহত ধারায় চলতে থাকবে জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তন। সেজন্য যতদিন না অন্তরে ভগবৎ-প্রেম বিকশিত হয়, ততদিন বার বার এক-

একটি জড়দেহ ধারণ হতে ঐ বদ্ধ জীবের কোনো অব্যাহতি নেই, জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল হতে সে বিমুক্ত হতে পারে না।

জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে মুক্তি ও জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-শুন্য শাশ্বত জীবন লাভের জন্য কেবল তাত্ত্বিক উপলব্ধিই পর্যাপ্ত নয় -- আরো বেশি কিছু প্রয়োজন। কেউ তার জড় দেহটি নয়, সে চিন্ময় আত্মা - - কেবল এই জ্ঞান মুক্তি লাভের জন্য পর্যাপ্ত নয়। আত্মা হচ্ছে চেতন সত্ত্বা, অজড় চিন্ময় সত্তা; আত্মা নিষ্ক্রিয় নয়, কমনাহীনও নয় ; চিন্ময় আত্মার স্বরূপগত বৃত্তি, ক্রিয়াকলাপ রয়েছে। তাই জড়বন্ধন হতে মুক্ত হতে হলে অবশ্যই চিন্ময় আত্মার স্বরূপগত স্তরে কর্ম করতে হবে। এই ধরণের কর্মকে বলা হয় ভগবৎ-প্রেমময় সেবা, বা ভক্তি। ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মধ্যে কর্মবন্ধন ও পুর্জন্মের চক্র হতে বিমুক্ত হওয়ার বহু প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ

১। ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের প্রথম নীতি-সূত্র হচ্ছে, ভক্তিযোগীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট সংখ্যক মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র —

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

— জপ করতে হবে।

২। আত্মার স্বরূপ, কর্মের নিয়ম, জন্মান্তর-প্রক্রিয়া, আত্মজ্ঞান লাভের উপায় এবং পরমপুরুষ ভগবান কৃষ্ণ সম্বন্ধে পুর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনের জন্য নিয়মিত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, বিশেষতঃ — ভগবদ্‌গীতা যথাযথ এবং শ্রীমদ্ভাগবত।

৩। কেবল নিরামিষ প্রসাদ আহার্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে কেবল তাঁকে নিবেদিত আহার্যই গ্রহণ করা উচিত, না হলে কর্ম-প্রতিক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়তে হবে। ভগবানকে খাদ্যবস্তু নিবেদন করার সরলতম পদ্ধতি হচ্ছে রাধা-কৃষ্ণের ছবির সামনে নিরামিষ খাদ্য দ্রব্য সুন্দরভাবে রাখা ও সরলভাবে প্রার্থনা করা, "প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ! অনুগ্রহ করে এই নিবেদিত আহার্যবস্তু গ্রহণ করুন", এবং এরপর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা। ভগবান খাদ্যের জন্য ক্ষুধার্ত নন, আমাদের প্রীতির জন্য ক্ষুধার্ত; তিনি আমাদের আন্তরিক প্রীতির বশবর্তী হয়ে নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য আহার করেন। এইভাবে এই প্রসাদ, বিশুদ্ধ খাদ্য দ্রব্য— শ্রীকৃষ্ণ যা গ্রহণ করেছেন — তা ভোজনের ফলে ভোজনকারী কর্ম-প্রতিক্রিয়ার বন্ধন হতে মুক্ত হয় এবং তাঁর চিত্তে জড় কলুষ-সঞ্চয় প্রতিহত হয়।

৪। মাংস, ডিম ও মাছ বর্জন করতে হবে। চা, কফি, অ্যালকোহল এবং তামাক-সহ সমস্ত রকম মাদকদ্রব্যও বর্জন করতে হবে। অবৈধ যৌনসঙ্গও বর্জনীয়। বিবাহ-বহির্ভূত বা সন্তানোৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যতীত যৌনকর্ম অবৈধ। স্মরণ রাখতে হবে যে ভ্রূণহত্যার ফলে এক বিশেষ কর্মফল উৎপন্ন হয় — যারা জন্মের পূর্বেই গর্ভস্থ শিশুদেরকে হত্যা করে, তাদেরকে পরবর্তী জন্মে এমন মায়েদের গর্ভে স্থাপন করা হয়, যাদের গর্ভপাত করানোর প্রবণতা রয়েছে। এইভাবে তারা মাতৃগর্ভে থাকা কালীন অবস্থায় একইরকম ভয়ঙ্করভাবে নিহত হয়। কিন্তু এমন পাপ করে

থাকলেই কেউ যদি ভবিষ্যতে আর পাপ কর্ম না করার সংকল্প করে এবং ভক্তিযোগ অবলম্বন করে ভগবানের দিব্য পবিত্র নাম নিরপরাধে কীর্তন করতে থাকে, সে ঐ সব পাপ-প্রতিক্রিয়া হতে মুক্ত হতে পারে।

৫। কৃতকর্মের ফল ভগবানকে সমর্পণ করা উচিত। দেহরক্ষার জন্য প্রত্যেকেই কর্ম করতে বাধ্য হয়, কিন্তু কেবল নিজের পরিতৃপ্তির জন্য যদি কর্ম করা হয়, তাহলে তাকে ভবিষ্যতে জন্ম জন্ম ধরে তার কৃতকর্মের ফলভোগে বাধ্য হতে হয়। ভগবদ্গীতায় সতর্ক করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তোষ বিধানের জন্যই কেবল কর্ম করা উচিত। এই ধরণের কর্ম হচ্ছে ভক্তিমূলক সেবা-কর্ম, এবং এতে কোনো কর্ম-প্রতিক্রিয়া বা কর্মবন্ধনের সৃষ্টি হয় না। কৃষ্ণভাবনাময় সকল কর্মই যজ্ঞ। প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই তাঁর শক্তি সময় ও অর্থ পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য ব্যয় করতে হবে। "বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত, তা না হলে কর্ম জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে।" (ভ.গ. ৩/৯) ভক্তিমূলক সেবা হিসাবে কৃত কর্ম-সম্পাদনকারীকে কেবল কর্ম-প্রতিক্রিয়া থেকেই মুক্ত করে না, তা ক্রমশঃ তাকে অপ্রাকৃত প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবার স্তরে তাঁকে উন্নীত করে — যা হচ্ছে ভগবদ্ধামে প্রবেশের মূল শর্ত-স্বরূপ।

নিজের পেশা পরিবর্তন করাটা প্রয়োজনীয় নয়। কেউ যদি লেখক

হন, তাহলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য লিখতে পারেন, কেউ চিত্রকর হলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য ছবি আঁকতে পারেন, কেউ রাঁধুনী হলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাঁধতে পারেন।অথবা কেউ যদি এভাবে সরাসরি কৃষ্ণ-কর্মে নিয়োজিত হতে সক্ষম না হন, তাহলে তিনি সারা বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের স্বার্থে উপার্জনের কিছু অংশ দান করার মাধ্যমে নিজ-কৃত কর্মের ফল ভগবানকে সমর্পণ করতে পারেন।

এই সরল পন্থাগুলি অনুসরণের মাধ্যমে যেকোনো ব্যক্তি কর্ম-ফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। পক্ষান্তরে, কেউ যদি এগুলি অনুসরণ না করে, তাহলে তাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে জড়-জীবনের কর্ম ও তার প্রতিক্রিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়তে হবে। প্রকৃতির নিয়ম অত্যন্ত কঠোর; দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ মানুষই এ-সম্বন্ধে সচেতন নয়। কিন্তু নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতার অজুহাতে রক্ষা পাওয়া যায় না। গতি-সীমা ভঙ্গ করে দ্রুত গতিতে গাড়ী চালানোর জন্য কেউ গ্রেপ্তার হওয়ার পর যদি সে বিচারকের কাছে এই অজুহাত দেখায় যে সে অনুমোদিত সর্বোচ্চ গতি-সীমার কথা জানত না, বিচারকের কাছে তার ঐ অজুহাত আদপেই গ্রাহ্য হবে না বা তার শাস্তিও লাঘব হবে না। কোনো ব্যক্তি যদি স্বাস্থ্য রক্ষার বিধি-নিয়ম না জানে, তাহলে প্রকৃতি তার অজ্ঞতার জন্য তাঁকে রোগাক্রান্ত হওয়া থেকে রেহাই দেবে না (অজ্ঞতা — না-জানাও এক ধরণের অপরাধ বা পাপ, নিজকৃত দোষ। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয় — অর্থাৎ মনুষত্যের জন্ম লাভ

করে। অজ্ঞশ্চ অশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি— ভ.গী. ৪/৪০)। সেজন্য জন্ম-মৃত্যুর অন্তহীন, যন্ত্রণাপ্রদ আবর্তন-চক্র হতে বিমুক্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কর্ম ও পুনর্জন্মের নিয়মটি বুঝতে হবে। তা না হলে আমাদের বার বার এই জড় জগতে নানা রকমের দেহে ফিরে আসতে হবে, আর আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে সেই দেহ সবসময় মানব দেহ নাও হতে পারে।

গীতা এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্র হচ্ছে নীতি নির্দেশিকা বা ইনস্ট্রাক্শান ম্যানুয়ালস্, যা আমাদের জীবনের গতিপথের প্রকৃত লক্ষ্য শিক্ষা দেয়। পুনর্জন্ম -বিজ্ঞান অবগত হওয়ার মাধ্যমে আমরা কর্মবন্ধন হতে বিমুক্ত হতে পারি এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি, যা সনাতন, জ্ঞানময় এবং দিব্যানন্দময়।





ভক্তিবেদান্ত স্তোত্রাবলী

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্

—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু

শ্লোক ১

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥

অনুবাদ—চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দ-সমুদ্রের বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হোন।

শ্লোক ২

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

অনুবাদ— হে ভগবান! তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন। এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', ' গোবিন্দাদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করেছ। সেই নামে তুমি তোমার সর্বশক্তি অর্পণ করেছ- এবং সেই নাম স্মরণের কালাদি-নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নি। হে প্রভু! এইভাবে কৃপা করে জীবের পক্ষে তুমি তোমার নামকে সুলভ করেছ, তবুও আমার নামাপরাধরূপ দুর্দৈব এমনই প্রবল যে তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মাতে দেয় না।

শ্লোক ৩

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

অনুবাদ—যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর মত সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য হয়ে অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সর্বদা হরিকীর্তনের অধিকারী ।

শ্লোক ৪

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং
বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

অনুবাদ— হে জগদীশ। আমি ধন, জন বা সুন্দরী রমণী কামনা করি না; আমি কেবল এই কামনা করি যে, জন্মে-জন্মে তোমাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হোক।

শ্লোক ৫

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

অনুবাদ—ওহে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর (দাস) হয়েও স্বকর্মবিপাকে বিষম ভব-সমুদ্রে পড়েছি। তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত-ধূলিসদৃশ রূপে চিন্তা কর।

শ্লোক ৬

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

অনুবাদ— হে নাথ। তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়ন-যুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হবে? বাক্য-নিঃসরণের সময়ে বদনে গদ্‌গদ্-স্বর নির্গত হবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকিত হবে?

শ্লোক ৭

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

অনুবাদ— হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'-সমূহ 'যুগ'বৎ বোধ হচ্ছে, চক্ষুদ্বয় মেঘের মত অশ্রুবর্ষণ করছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হচ্ছে।

শ্লোক ৮

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ।।

অনুবাদ—এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্মাহতই করুন, তিনি লম্পট পুরুষ, আমার সঙ্গে যে রকম আচরণই করুন না কেন, তিনি সর্বদা আমারই প্রাণনাথ।



শ্রীউপদেশামৃত

শ্লোক ১

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ।। ১ ।।

অনুবাদ— যে সংযমী ব্যক্তি বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, উদর এবং উপস্থের বেগ— এই ষড় বেগ দমন করতে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করতে পারেন।

শ্লোক ২

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি।। ২ ।।

অনুবাদ— প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ বা প্রয়োজনাধিক অর্থ সঞ্চয়, পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য অত্যধিক প্রচেষ্টা করা, কৃষ্ণ-বিহীন অনাবশ্যক গ্রাম্য-কথন, পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য প্রয়াস না করে শুধুমাত্র শাস্ত্রের নিয়ম-নীতিগুলি অনুসরণ করার জন্যই তাদের অনুশীলন করার প্রচেষ্টা বা শাস্ত্রের নির্দেশ অমান্যপূর্বক ব্যক্তিগত খেয়াল বা ইচ্ছানুসারে কার্য-সম্পাদন করার প্রচেষ্টা, কৃষ্ণভাবনাবিমুখ জড়বিষয়ী লোকের সঙ্গ করা, পার্থিব বিষয় লাভ করার বাসনায় ব্যাকুল হওয়া—কোন ব্যক্তি যখন উপরোক্ত ছয়টি দোষের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তার পারমার্থিক জীবন বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ৩

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্যাৎ তত্তৎ কর্ম-প্রবর্তনাৎ
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ।। ৩ ।।

অনুবাদ— ভক্তিযোগে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সেবাকার্য সম্পাদন করার অনুকূলে ছ'টি প্রধান নিয়ম বা বিধি বর্তমান আছে। যথা সেবাকার্যে উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস বা সংকল্প, ধৈর্য-ধারণ, নববিধা ভক্তির বিধি অনুসারে সেবাকার্য সম্পাদন, আসক্তি ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ,

পূর্বতন আচার্যবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ। এই ছয়টি বিধি অনুসারে পারমার্থিক জীবন-যাপন করলে ভক্তিযোগে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করা যাবে।

শ্লোক ৪

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়বিধং প্রীতিলক্ষণম্।।

অনুবাদ— ভগবদ্ভক্তকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্বক দান, তার নিকট হতে কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহণ, নিজের মনের কথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা এবং তার নিকট হতে ভজন বিষয়ক গুহ্য তথ্যাদি জিজ্ঞাসা করা, ভক্ত প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্বক প্রসাদ ভোজন করান—ভক্তসঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের এই ছয়টি প্রধান লক্ষণ।

শ্লোক ৫

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা।। ৫ ।।

অনুবাদ— যে ভগবদ্ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করেন, তাঁকে মনে মনে আদর করা উচিত এবং যিনি দীক্ষিত হয়ে শ্রীবিগ্রহের সেবায় রত আছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন

করা উচিত। আর যে শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর ভগবদ্ভজনে প্রকৃত উন্নত, যার হৃদয় অন্যের নিন্দাদি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত তাঁর সঙ্গ করা উচিত এবং তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর সেবা করা উচিত।

শ্লোক ৬

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদফেন পঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ।। ৬ ।।

অনুবাদ— একজন শুদ্ধ ভক্ত, যিনি তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন অর্থাৎ শুদ্ধ ভগবৎ-চেতনা লাভ করেছেন, তিনি প্রাকৃত দৃষ্টিতে কোন কিছু দর্শন করেন না। এরূপ ভক্তকেও প্রাকৃত দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত নয়। আপাত-দৃষ্টিতে কোন শুদ্ধভক্তকে নিচ-কুলোদ্ভব, কুৎসিত, বিকলাঙ্গ বা রোগগ্রস্ত বলে মনে হলেও তাঁকে উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁর সেই দৈহিক ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি থাকতে পারে, কিন্তু শুদ্ধভক্ত কখনও তার দ্বারা কলুষিত হয়ে পড়েন না। এটা ঠিক গঙ্গাজলের মতো। গঙ্গাজল যেমন কখনও কখনও বুদ্‌বুদ্, ফেনা বা কাদা-পাঁকের দ্বারা ঘোলা হয়ে যায়, কিন্তু তা বলে গঙ্গার জল অপবিত্র হয়ে যায় না এবং যাঁরা পারমার্থিক জীবনে উন্নত, তাঁরা গঙ্গাজলের গুণাগুণ বিচার না করেই পবিত্রতা লাভ করার জন্য সেই জলে স্নান করে থাকেন।

শ্লোক ৭

স্যাৎকৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী ।। ৭ ।।

অনুবাদ— ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম, গুণ, লীলাদি এবং কর্মসমূহ দিব্য মধুর রসে রসান্বিত। যদিও ভগবদ্-বিমুখ ব্যক্তির জিহ্বা অবিদ্যারূপ পাণ্ডুরোগের (Jaundice) দ্বারা আক্রান্ত থাকার ফলে সে মধুর ভগবৎ-তত্ত্বের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না, কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যহ যদি সে পরম নিষ্ঠা বা যত্নের সঙ্গে মধুর হরিনাম কীর্তন করে, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সে (জিহ্বায়) এক মধুর রসের আস্বাদন লাভ করবে এবং এইভাবে তার রোগ ক্রমে ক্রমে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

শ্লোক ৮

তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশ-সারম্।। ৮ ।।

অনুবাদ— সমগ্র উপদেশ সমূহের সারাংশ হল এই যে, প্রত্যেকের শ্রীভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা আদি উত্তমরূপে

নিরন্তর কীর্তন ও স্মরণ করে সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। এই উপায়ে মন ও জিহ্বা ক্রমে ক্রমে ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত হবে। এইভাবে ব্রজধামে (গোলোক বৃন্দাবন ধাম) বাসপূর্বক কৃষ্ণভক্তের আনুগত্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত, এবং ভগবানের ভক্তি-সেবায় নিমগ্ন তাঁর প্রিয় ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত।

শ্লোক ৯

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ।। ৯ ।।

অনুবাদ— মথুরা নামক দিব্য স্থান ঐশ্বর্যময় অপ্রাকৃত জগৎ বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ শ্রীভগবান স্বয়ং সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবার বৃন্দাবনের অরণ্য মথুরা মণ্ডল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে রাসলীলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এবং গোবর্ধন পর্বত বৃন্দাবন-অরণ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ তা শ্রীভগবানের চিন্ময় হস্তের দ্বারা উত্তোলিত হয়েছিল এবং সেখানে ভগবান নানাবিধ প্রেমময় লীলা-বিলাস সাধন করেছিলেন এবং এই সবের ঊর্ধ্বে পরম রমণীয় রাধাকুণ্ড হল সর্বোত্তম স্থান, তার কারণ তা গোকুলরাজ শ্রীকৃষ্ণের অমৃতোপম প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। সুতরাং এমন কোন বিবেকী ব্যক্তি কি কোথাও আছেন

যিনি গোবর্ধন পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এমন পরম রমণীয় রাধাকুণ্ডের সেবা করতে অভিলাষী নন্?

শ্লোক ১০

কর্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী।। ১০ ।।

অনুবাদ— শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, সকল প্রকার সৎকর্মনিরত পুণ্যবান কর্মীর তুলনায় চিদান্বেষী জ্ঞানী শ্রীহরির প্রিয়। ঐ সকল জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং যাঁরা তাঁদের উন্নত জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তির স্তর লাভ করেছেন, তাঁরা ভগবানের ভক্তি-সেবা লাভ করতে পারেন। তিনি অন্যান্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ এবং যিনি প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন তিনি ঐ মুক্তি প্রাপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রজনারীগণ (গোপীগণ) ভক্তির অনন্য স্তরে অধিষ্ঠিতা, কারণ তাঁরা কৃষ্ণগতপ্রাণা। ঐ ব্রজনারীগণের বা গোপীদের মধ্যে আবার শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। গোপীদের মধ্যে প্রিয়তম এই গোপীটির মতো (শ্রীমতী রাধারাণীর মতো) তাঁর কুণ্ডও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিগূঢ়ভাবে প্রিয়। সুতরাং এমন কে আছেন যিনি রাধাকুণ্ডের এমন অপ্রাকৃত ভাবময় পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করে রাধাগোবিন্দের

'অষ্টকালীয়' ভজন না করবেন? বাস্তবিকপক্ষে যাঁরা রাধাকুণ্ডের তীরে রাধাকৃষ্ণের ভজন-সাধন করেন, তাঁরা পরম সৌভাগ্যবান।

শ্লোক ১১

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি।। ১১

অনুবাদ— শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজভূমির প্রেমময়ী গোপবালিকাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং তাঁর সরোবরও তাঁরই মতো শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। শাস্ত্রে মুনিগণ এইরূপে বর্ণনা করেছেন। এমন কি এই রাধাকুণ্ড মহান্ মুনিগণের দুর্লভ বস্তু। সুতরাং সাধারণ ভক্তের নিকট তা প্রকৃতই দুর্লভ। সুতরাং কেউ যদি সেই পবিত্র সরোবরে একবার অবগাহন করেন, তা হলে তাঁর অন্তরে ভগবৎ প্রেমের উদয় হবে।



শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা

শ্লোক ১

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।।

অনুবাদ— সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি—অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ।

শ্লোক ৩০

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

অনুবাদ—মুরলীগান-তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লচক্ষু, ময়ূর-পুচ্ছ শিরোভূষণ, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর-শরীর কোটি-কন্দর্পমোহন বিশেষ-শোভা-বিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৩২

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।

আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

অনুবাদ— সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি; তাঁহার বিগ্রহ—আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল; সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন এবং কলন করেন।





ভগবদ্‌গীতার কয়েকটি নির্বাচিত শ্লোক

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ।। ২/১৪ ।।

অনুবাদ ঃ— হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়, সেগুলি ঠিক যেন শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুল প্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ।। ২/২৭ ।।

অনুবাদ ঃ— যার জন্ম হয়েছে তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। অতএব তোমার কর্তব্য সম্পাদন করার সময় শোক করা উচিত নয়।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ।। ২/৪০ ।।

অনুবাদ ঃ— ভক্তিযোগের অনুশীলন কখনো ব্যর্থ হয় না এবং তার কোনও ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররূপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ।। ২/৪৭ ।।

অনুবাদ ঃ—স্বধর্ম বিহিত কর্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্মফলে তোমার অধিকার নেই। কখনো নিজেকে কর্মফলের হেতু বলে মনে করো না, এবং কখনো স্বধর্ম আচরণ থেকে বিরত হয়ো না।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ।। ২/৫৯ ।।

অনুবাদ ঃ— দেহবিশিষ্ট জীব ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগ থেকে নিবৃত্ত হতে

পারে, কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন করার ফলে সেই বিষয়-তৃষ্ণা থেকে তিনি চিরতরে নিবৃত্ত হন।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ।। ৩/২১ ।।

অনুবাদ ঃ— শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরাও তার অনুকরণ করেন। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, অন্য লোকে তারই অনুসরণ করে।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ।। ৬/৩৪ ।।

অনুবাদ ঃ— হে কৃষ্ণ, মন অত্যন্ত চঞ্চল, প্রবল এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি বিক্ষেপ উৎপাদক, তাকে বিষয় বাসনা থেকে নিবৃত্ত করা অত্যন্ত কঠিন, তাই এই মনকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভূত করার থেকেও কঠিন বলে আমি মনে করি।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ।। ৬/৩৫ ।।

অনুবাদ ঃ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে মহাবাহো, মন যে দুর্বার ও চঞ্চল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ।। ৭/৭ ।।

অনুবাদ ঃ— হে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। সূত্রে যেমন মণিসমূহ গাঁথা থাকে, তেমনই সমস্ত বিশ্বই আমাতে ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থান করে।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ।। ৭/২৫ ।।

অনুবাদ ঃ—আমি মূঢ় ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি। তাই, তাঁরা আমার অজ ও অব্যয় স্বরূপকে জানতে পারে না।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ।। ৭/২৮ ।।

অনুবাদ ঃ— যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব এবং মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ।। ৮/৬ ।।

অনুবাদ ঃ—মৃত্যুর সময়ে যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন,

তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ।। ৯/২৭ ।।

অনুবাদ ঃ— হে কৌন্তেয়, তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।। ১১/৫৪।।

অনুবাদ ঃ— হে অর্জুন, অনন্য ভক্তির দ্বারাই কেবল আমাকে জানতে ও স্বরূপত প্রত্যক্ষ করতে এবং আমার চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।।১৫/৭।।

অনুবাদ ঃ— এই জড় জগতে বদ্ধজীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মন সহ ছটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতি রূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ।। ১৮/৫৪ ।।

অনুবাদ ঃ— ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোনোকিছুর জন্য শোক

করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমদর্শী হয়ে আমার পরাভক্তি লাভ করেন।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ।। ১৮/৫৫ ।।

অনুবাদ ঃ— ভক্তির দ্বারা কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানার ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ।। ১৮/ ৬৮ ।।

অনুবাদ ঃ— যিনি আমার ভক্তদের এই পরম গোপনীয় জ্ঞান উপদেশ করেন, তিনি অবশ্যই পরা ভক্তি লাভ করবেন এবং অবশেষে আমার কাছে ফিরে আসবেন।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।। ১৮/ ৬৯ ।।

অনুবাদ ঃ— এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে তার থেকে অধিক প্রিয়কারী এবং আমার প্রিয় আর কেউ নেই এবং কখনও হবে না।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ।। ১৮/৭৩ ।।

অনুবাদ ঃ— অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ, হে অচ্যুত, তোমার কৃপায়

এখন আমার মোহ দূর হয়েছে। আমার স্মৃতি ফিরে এসেছে এবং আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে। আমি তোমার নির্দেশ অনুসারে আচরণ করব।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।। ১৮/৭৮ ।।

অনুবাদ ঃ– যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই নিশ্চিতভাবে শ্রী, বিজয়, অসাধারণ শক্তি ও নীতি বর্তমান থাকে। সেটিই আমার অভিমত।

সমাপ্ত